KOLKATA (CALCUTTA) BOARD
For more e-books in bengali please visit: http://www.calcuttaglobalchat.net/invboard
Note: This pdf is not a product of Kolkata Board and the administrators may remove the content without any notification.

Kolkata Radio: http://www.kolkataradio.calcuttaglobalchat.net
Kolkata Photoalbum: http://www.calcuttaglobalchat.net/cgc-album
Kolkata Music Blog: http://www.calcuttaglobalchat.net/calcuttablog
Kolkata Information center: http://www.calcuttaglobalchat.net/kolkata-info
Official Home page: http://www.calcuttaglobalchat.net

হুমায়ূন আহমেদ

অন্যদিন

$3.50

হুমায়ূন আহমেদ

অন্যদিন

খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি
৬৭ প্যারীদাস রোড ঢাকা ১১০০

'অন্যদিন' গল্পটি স্বাধীনতা সংখ্যা বিচিত্রায় (১৯৭৬) প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় গল্পটি আবার আগাগোড়া নতুন করে লিখেছি। এক সময় জনাব নূরুননবী শেখ এবং জনাব ডঃ মুহম্মদ জাফর ইকবাল 'অন্যদিন' গল্পটির জন্য গাঢ় ভালোবাসা প্রকাশ করেছিলেন। সেই ভালোবাসা এখনো আছে কিনা জানি না। না থাকলেও আজ তাঁদের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

ডঃ হুমায়ূন আহমেদ
রয়াসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
জনু, ৭, ১৯৮৩

"এই দিনত দিন নয় আরো দিন আছে
এই দিনেরে নিব আমি সেই দিনের কাছে।"

॥ এক ॥

পান্থ নিবাস বোর্ডিং হাউস
১১-বি কাঁঠাল বাগান লেন (দোতলা)
ঢাকা-৯

চিঠি লিখলে এই ঠিকানায় চিঠি আসে। খুঁজে বের করতে গেলেই মুশকিল। সফিক লিখেছিল অবশ্যি, তোর কষ্ট হবে খুঁজে পেতে। লোকজনদের জিজ্ঞেস করতে পারিস কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না। একটা ম্যাপ এঁকে দিলে ভাল হত। তা দিলাম না, দুর্লভ জিনিস পেতে কষ্ট করতেই হয়।

এই সেই দুর্লভ জিনিস? দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না এরকম একটা গলির পাশে ঘুপসি ধরনের দোতলা বাড়ী। কত দিনের পুরানো বাড়ী সেটি কে জানে। চিতি পরে সমস্ত বাড়ী কালচে সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। দোতলায় একটি ভাঙ্গা জানালায় ছেড়া চট ঝুলছে। বাড়ীটির ডান পাশের দেয়ালের একটি অংশ সম্পূর্ণ ধ্বসে গিয়েছে। সামনের নর্দমায় একটি মরা বেড়াল; দূষিত গন্ধ আসছে সেখান থেকে। মন ভেঙ্গে গেল আমার। স্যুটকেস হাতে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি–দোতলায় যাবার পথ খুঁজছি, সিঁড়ি ফিড়ি কিছুই দেখছিনা। নিচ তলা তালাবন্ধ। নোটিশ ঝুলছে–

'এই দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।'

দোতলার জানালার চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে কে যেন দেখছিল আমাকে। তার দিকে চোখ পরতেই সে বললো, জ্যোতিষী খুঁজছেন? হাত দেখাবেন? উপরে যান, বাড়ীর পেছন দিকে সিঁড়ি।

পান্থ নিবাস বোর্ডিং হাউসের লোকজন আমার চেনা। সফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছে আমাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে যার সঙ্গে দেখা হল তিনি যে নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব তা সফিকের চিঠি ছাড়াও বলে দিতে পারতাম। প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা ঝাকড়া ঘন চুলের একজন মানুষ কপালে প্রকান্ড এক সিঁদুরের ফোঁটা, মুখ ভর্তি দাড়ি। গায়ে গেরুয়া রংয়ের একটি চাদর। পরনে খাটো করে পরা একটি ধবধবে সাদা সিল্কের লুঙ্গি। পায়ে রুপোর বোলের খরম। প্রথম দর্শনেই হকচকিয়ে যেতে হয়। জ্যোতির্ষাণব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'হস্ত গণনা করাতে এসেছেন?' পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, উঁহু স্যুটকেস হাতে কেউ জ্যোতিষীর কাছে আসেনা। লক্ষণ বিচারে ভুল হয়েছে। তুমি সফিকের কাছে এসেছ?'

জ্বি।

সফিক সারা সকাল অপেক্ষা করেছিল। তোমার না ভোরবেলা আসার কথা?

ট্রেন ফেল করলাম। ঢাকা মেইলে আসা লাগল।

জ্যোতির্ষাণব মহা গম্ভীর হয়ে বললেন,

আমি জানতাম। সফিককে বললাম আশাভঙ্গ হওয়ার কারণ ঘটবে। সে সারা সকাল রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আশাভঙ্গতো হলই ঠিক কিনা তুমি বল?

হ্যাঁ তা ঠিক।

ঠিকতো হবেই। তিন পুরুষ ধরে গুহ্য বিদ্যার চর্চা আমাদের হুঁ হুঁ।

জ্যোতির্ষাণব আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। তাঁর ঘরের বর্ণনা সফিকের চিঠিতে পড়েছি। বাড়িয়ে লিখেনি কিছুই–ঘরে ঢুকলে যে কোন সুস্থ লোকের মাথা গুলিয়ে যাবে। তিনি জানালা বন্ধ করে ঘরটা সব সময় অন্ধকার করে রাখেন। অন্ধকার ঘরে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। ধূপদানী আছে, কেউ হাত দেখাতে আসছে টের পেলেই ধূপদানীতে এক গাদা ধূপ ফেলে নিমিষের মধ্যে গা ছমছমানো আবহাওয়া তৈরী করে ফেলেন। কিন্তু এতসব করেও তাঁর পসার নেই মোটেও।

জ্যোতির্ষাণব আমাকে চৌকিতে বসিয়ে ধূপদানীতে ধূপ ঢেলে দিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। থমথমে গলায় বললেন,

উদ্দেশ্য সফল হবে তোমার। বি.এ. পাশ করবে ঠিকমত। কপালে রাজানুগ্রহের যোগ আছে। গ্রহ শান্তির একটা কবচ নিও আমার কাছ থেকে। সফিকের বন্ধু তুমি। নামমাত্র মূল্যে পাবে। আমি বললাম,

কোথায়ও একটু গোসল করা যাবে? আসে পাশে চায়ের দোকান আছে? বড় চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জ্যোতির্ষাণব আঁতকে উঠলেন। যেন এমন অদ্ভুত কথা কখনো শুনেন নি। রাগী গলায় বললেন, স্বাস্থ্য বিধির কিছুই দেখি জাননা। গায়ের ঘাম না মরতেই গোসল চা। ঠান্ডা হয়ে বস দেখি।

তিনি একটি টেবিল ফ্যান চালু করলেন। ফ্যানটি নতুন। ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বললেন,

আমার এক ভক্ত দিয়েছে। এই সব বিলাস সামগ্রী দুই চক্ষে দেখতে পারিনা। তান্ত্রিক মানুষ আমরা–এসব কি আমাদের লাগে? শীত গ্রীষ্ম সব আমাদের কাছে সমান।

ঘন্টা দুয়েক অপেক্ষা করবার পর জ্যোতির্ষাণব আমাকে গোসলখানা দেখিয়ে দিলেন।

খুব সাবধানে গোসল সারবে রঞ্জু। দারুণ পিছল মেঝে। মেসের অন্য বোর্ডাররা কেউ নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা থাক গোসল খানায়। চা আমি বানিয়ে রাখব এসেই গরম পাবে। কয় চামচ চিনি খাও চায়ে?

গায়ে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। বরফের মত ঠান্ডা পানি। পথের ক্লান্তি, নতুন জায়গায় আসার উদ্বেগ সব মুছে গিয়ে ভাল লাগতে শুরু করল। হঠাৎ করেই মনে হল নীলগঞ্জের পুকুরে যেন ভর দুপুরে সাঁতার কাটছি। আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি সুখী হওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষের। অতি সামান্য জিনিসও মানুষকে অভিভূত করে ফেলতে পারে।

আমার বাবার কথাই ধরা যাক। তাঁর মত সুখী লোক এ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই বলেই আমার ধারণা। অথচ গত ছয় বছর ধরে তাঁর কোন চাকরী বাকরী নেই। তিনি ভোর বেলা উঠেই ষ্টেশনে যান। সেখানকার চায়ের ষ্টলটি নাকি 'ফাস ক্লাস' চা বানায়। খালি পেটে ঐ চা পর পর দু' কাপ খাবার পর তিনি ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে গল্প গুজব করেন। কি গল্প করেন তিনিই জানেন। ন' টার দিকে স্কুলের ভাত রান্না হয় বাড়ীতে। সে সময় তিনি বাড়ী ফিরে আসেন। আনজু এবং পারুলের সঙ্গে অতি দ্রুত ভাত খেয়ে নেন। সময় তাঁর হাতে খুব অল্প কারণ সাড়ে দশটার দিকে পোষ্টাপিসে খবরের কাগজ আসে। কাগজটি পড়া তাঁর কাছে ভাত খাওয়ার মতই জরুরী। সন্ধ্যাবেলা তিনি হারু গায়েনের ঘরে বেহালা বাজানো শিখেন। বর্তমানে এই দিকেই তাঁর সমস্ত মন প্রাণ নিবেদিত। মহাসুখী লোক তিনি। মা যদি বলেন,

পারুলেরতো নাম কাটা গেছে স্কুলে। তিন মাসের বেতন বাকি।

বাবা চোখে মুখে দারুণ দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে বলেন, বড়ই মুশিবত দেখছি। গভীর সমুদ্র। হুঁ যত মুশকিল ততো আহসান। হাদিস কোরানের কথা। চিন্তার কিছু দেখিনা। সমস্যার সমাধানও বের করেন সঙ্গে সঙ্গে, দরকার নাই স্কুলে পড়ার। পারুল মা, প্রাইভেটে মেট্রিক দিবে তুমি। আমি পড়াব তোমাকে। বইগুলি সব নিয়ে আয়তো মা এবং তিন নম্বরী একটা খাতা আন রুটিনটা লেখি আগে।

মা ছাড়া আমরা কেউ বিরক্ত হইনা বাবার উপর। আমরা ছোট বেলা থেকেই জানি বাবা এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। এই জগতের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তাঁর কোন যোগ নেই।

আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে বাবা ষ্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে আমাকে বললেন,

রঞ্জু, একটু এদিকে শুনে যাতো।

পারুল আর আনজুর কাছ থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেলেন আমাকে। গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে বললেন,

একটা ভালো বেহালার দাম কত, খোঁজ নিবিতো। ভুলিসনা যেন।

খোঁজ নিব। ভুলবনা।

আমার নিজের জন্যে না। বুড়ো বয়সে কি আর গান বাজনা হয়? তোর মাও পছন্দ করে না। অন্য লোকের জন্য।

আমি খোঁজ নিব।

ট্রেন ছাড়ার সময়ও এক কান্ড করলেন। ট্রেনের সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলেন। ট্রেনের গতি যত বাড়ে তাঁর গতিও বাড়ে। ট্রেনের লোকজন গলা বাড়িয়ে মজা দেখতে লাগলো।

গোসল সেরে দোতলায় উঠে এসে দেখি জ্যোতির্যাণবের ঘর জমজমাট। দু' তিন জন লোক বসে আছে পাংশু মুখে। জ্যোতির্যাণব একজনের হাতের তালুর দিকে অখন্ড মনযোগে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে যাও। চা পিরিচে ঢাকা।

আগে লক্ষ্য করিনি যে পায়রার খুপড়ির মত ঘরও পর্দা দিয়ে দু'ভাগ করা। ভেতরে ঢুকে দেখি দড়ির খাটিয়ার উপর ধবধবে সাদা চাদরে চমৎকার বিছানা করা। বিছনার লাগোয়া একহাত বাই একহাত সাইজের টেবিল একটি। তার উপরও ধবধবে সাদা ঢাকনি। খাটিয়াটার মাথার পাশে বেতের শেল্ফ। শেলফের উপর চমৎকার একটি কাঁচের ফুলদানীতে ফুল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইলনা। জ্যোতির্যাণব দেখি দারুণ সৌখিন লোক।

শুধু চা নয়। পিরিচে খাবার ঢাকা আছে। একটি লাড্ডু এবং একটি সিঙ্গারা। আমি চা খেতে খেতে শুনলাম জ্যোতির্যাণব গম্ভীর গলায় বলছেন,

গ্রহ শান্তি কবচ নিতে পারেন আমার কাছ থেকে। রত্নও ধারণ করতে পারেন। তবে রত্ন অনেক দামী। তাছাড়া আসল জিনিস মিলবেনা, চারদিকে জুয়াচুরি।

গ্রহ শান্তিতে কত খরচ পড়বে?

বিশ টাকা নেই আমি, তবে আপনার জন্যে দশ।

দশ যে বড় বেশি হয়ে যায় সাধুজী।

জ্যোতির্যাণব হাসেন।

পঞ্চ ধাতুর কবজের দামই মশাই পাঁচ টাকা। তাম্র স্বর্ণ রৌপ্য পারা ও দস্তা। তঞ্চকতা পাবেন না আমার কাছে। একবার ধারণ করে দেখুন টাকাটা জলে যায় কিনা। টাকাইতো জীবনের সব নয়। হুঁ হুঁ।

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে যায় আমার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে, ঘর অন্ধকার। সুইচ আছে একটি। আলো জ্বালাতে ঠিক সাহস হয় না। সাধুজী পাশের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন। কে জানে ইলেকট্রিসিটির আলোতে তাঁর হয়তো অসুবিধা হবে। সফিক কত রাতে ফিরবে কে জানে? শুয়ে পড়লাম সাধুজীর বিছানাতেই।

শুয়ে শুয়ে কত কি মনে হয়। বাবা যেন ম্যাকমিলান কোম্পানির তাঁর সেই পুরানো চাকরীটা আবার ফিরে পেয়েছেন। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন প্রকান্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে। পারুলের বিছানার পাশে ঝুঁকে ডাকছেন,

ওরে পারুল, ওরে টুনটুনি, ওরে কুট কুট, ওরে ভুট ভুট।

মা কপট রাগের ভঙ্গি করে বলছেন,

কি যে পাগলামী তোমার। এই দুপুর রাতে মাছ কুটতে বসব নাকি?

বাবার মুখ ভর্তি হাসি।

একশ বার বসবে। হাজার বার বসবে।

পারুল ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসেছে। বার বার বলছে,

বইটা এনেছ বাবা? 'দেশ বিদেশের রূপকথা' নাম লিখে চিঠি দিয়েছিলাম যে তোমাকে?

উহুঁ বড্ড ভুল হয়ে গেছেরে। একটুও মনে নেই। সামনের শনিবার ঠিক দেখিস–

পারুলের নিচের ঠোঁট বেঁকে যেতে শুরু করতেই বাবা ম্যাজিসিয়ানের ভঙ্গিতে বলে উঠেছেন,

টেবিলের উপর রূপকথার বইটা আবার কে আনল?

ঝিমুনি ধরলেও ঘুম আসেনা আমার। বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। ধূপের গন্ধে দম আটকে আসে একেকবার। কি যে কান্ড সাধুজীর। সফিক চিঠিতে লিখেছিল, 'দুনিয়াতে মন্দ মানুষ এত বেশি বলেই ভাল মানুষদের জন্য আমাদের এত মন কাঁদে। আমাদের নিশানাথ এমন একজন ভাল মানুষ। মানুষকে ধোঁকা দেওয়াই যার জীবিকা–সে এমন ভাল মানুষ হয় কি করে কে জানে?'

রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সফিকের দেখা পাওয়া গেল না। নিশানাথ বাবু আমাকে বসিয়ে রেখে নিচে খেতে গেলেন। খাওয়ার পর আমাকে হোটেল থেকে খাইয়ে আনবেন।

হোটেলটি বেশ খানিকটা দূরে। নানান প্রসঙ্গে গল্প করতে করতে সাধুজী হাঁটছেন। অনেকেই দেখি তাঁকে চেনে। একটি পানওয়ালা দাঁত বের করে বললো,

সাধুজীর শইলটা বালা নাকি?

তিনি থেমে থেমে বেশ খানিকক্ষণ কথা বার্তা বললেন পানওয়ালার সঙ্গে। তাঁর গল্প বলার ঢং চমৎকার। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। সফিক প্রসঙ্গে বলেন,

সফিক ছেলেটা ভাল তবে বড় ফাজিল। ফাজলামী করে আমার সঙ্গে। আমি নাকি লোক ঠকিয়ে খাই। ছিঃ ছিঃ কি কুৎসিত চিন্তা। আমরা হচ্ছি তিন পুরুষের জ্যোতিষী। আমার ঠাকুরদা তারানাথ চক্রবর্তী ছিলেন সাক্ষাৎ বিভূতি। মানুষের হাত দেখে জন্মবার বলতে পারতেন। আজকালকার ছেলে পুলেরা এসবের কি জানবে?

কথা বলতে বলতে সাধুজীর মুখের ভাব বদলায়। রশীদ মিয়ার কথা বলতে বলতে তিনি চোখ মুখ কুঁচকে এমন ভাবে তাকান যেন রশীদ মিয়া ছুরি হাতে মারতে আসছে। 'রশীদ মিয়া, বুঝলে নাকি রঞ্জু? নরকের কীট। দেখা হলেই বলবে–বিজনেস কেমন চলছে আপনার?'

আমি চুপ করে থাকি। সাধুজী রাগী গলায় বললেন,

হাত দেখা বিজনেস হলে আজ আমার গাড়ী বাড়ী থাকতো। সুসং দুর্গাপুরের জমিদার ভূপতি সিংহ আমার ঠাকুরদাকে আশি বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি দিতে চাইলেন। ঠাকুরদা বললেন, 'ক্ষমা করবেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সম্পত্তির মোহে পড়তে চাই না। রশীদ মিয়া কি বুঝবে আমাদের ধারা?'

সফিক ফিরতেই তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল জ্যোতির্যাণবের সঙ্গে। সফিক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'আমার ঘরের চাবি দিয়ে গেলাম আপনার কাছে। বললাম, রঞ্জু আসামাত্র আমার ঘর খুলে দেবেন তা না নিজের অন্ধ কূপের ধোঁয়ার মধ্যে নিয়ে——

তাতে তোমার বন্ধুর কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে?

না হোক মেসে রঞ্জুর জন্যে রান্না করতে বলে গেছি। টাকা খরচ করে তাকে হোটেল থেকে খাইয়ে এনেছেন। টাকা সস্তা হয়েছে?

টাকার মূল্য আমার কাছে কোন কালেই নেই সফিক।

বড় বড় কথা বলবেন না। লম্বা লম্বা বাত শুনতে ভাল লাগে না।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে সফিক এত হৈ চৈ করছে কেন বুঝতে পারলাম না। আমার লজ্জার সীমা রইল না।

সফিকের ঘরে দুটি চৌকি পাতা। আবর্জনার স্তূপ চারদিকে। দীর্ঘ দিন সম্ভবত ঝাট দেয়া হয় না। এক পাশে একটি থালায় অভুক্ত ভাত পড়ে আছে। সফিক আমাকে বলল,

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। সকালে কথা বলব।

তুই কোথায় যাস?

খেয়ে আসি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খেয়ে এসেই বিছানায় কাত হব। কথা বার্তা যা হবার সকালে হবে। তুই ঘুমো।

সফিক নিচে নেমেও খুব হৈ চৈ করতে লাগলো,

হারামজাদা ডাল শেষ হয়ে গেছে মানে? পয়সা দেইনা আমি? আমি মাগনা খাই? যেখান থেকে পারিস ডাল নিয়ে আয়।

সাধু বাবা ডাল খেয়ে ফেলেছে।

সাধু বাবার বাপের ডাল।

সফিক বড্ড বদলে গেছে। এ রকম ছিল না কখনো শরীরও খুব খারাপ হয়েছে। কোন অসুখ বিসুখ বাঁধিয়েছে কিনা কে জানে। আমিতো প্রথম দেখে চিনতেই পারিনি। চমৎকার চেহারা ছিল সফিকের। স্কুলে 'মুকুট' নাটক করেছিলাম আমরা। সফিক হয়েছিল মধ্যম রাজকুমার। সত্যিকার রাজপুত্রের মত লাগছিল। কমিশনার সাহেবের বৌ সফিককে ডেকে পাঠিয়ে কত কি বলেছিলেন।

॥দুই॥

সকাল বেলা সফিক আমাকে নিয়ে গেল রশীদ মিয়ার কাছে। রশীদ মিয়া তাঁর রেজিষ্টি খাতায় আমার নাম তুলবেন। লোকটি ছোট খাট। সামনের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। সেই দাঁত দুটি ছাড়া আর সমস্ত দাঁতে কুৎসিত হলুদ রং। আমি পান্থনিবাসে বোর্ডার হব শুনে তিনি এমন ভাব করলেন যেন এমন অদ্ভুত কথা এর আগে শুনেন নি।

না সাহেব বোর্ডার আর নেব না। শুধু শুধু ঝামেলা।

সফিক গম্ভীর হয়ে বলল,

কিসের ঝামেলা?

টাকা পয়সা নিয়ে খেঁচামেচি করে।

আমি, আমি খেঁচামেচি করি?

আপনি না করেন অন্য লোকে করে।

আমাকে নিয়ে কথা। আমি যদি না করি এও করবে না। মাসের তিন তারিখে খ্যাচাং করে টাকা ফেলে দিবে। নবী সাহেবের ঘরটা দেন তার নামে।

নবী সাহেব গেলে তবেতো দিব?

যতদিন না যান ততদিন থাকবে আমার ঘরে।

রশীদ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

ঐ ঘরের ভাড়া এই মাস থেকে পাঁচ টাকা বেশি।

সফিক প্রায় তেড়ে গেল।

পাঁচ টাকা বেশি কেন? মোজাইক করে দিচ্ছেন ঘরটা?

রশীদ মিয়া নির্লিপ্ত সুরে বলল,

জানালা দুইটা। ঐ ঘরে আলো বাতাস বেশি খেলে।

একটা জানালা পেরেক মেরে বন্ধ করে দিবেন। সাফ কথা। খুলেন আপনার খাতা।

নিতান্ত গোমড়া মুখে খাতা খুললো রশীদ মিয়া।

পেশা কি?

আমি আমতা আমতা করে বললাম,

পেশা কিছু নাই–আমি ছাত্র।

ঝপাং করে খাতা বন্ধ করে রশীদ মিয়া আতংকিত স্বরে বললেন,

ছাত্র মানুষ ঘর ভাড়া পাবে কোথায়?

সফিক থমথমে গলায় বলল,

যেখান থেকে পারে যোগাড় করবে। দরকার হয় চুরি করবে।

চুরি করবে?

হ্যাঁ, চুরি করবে। অসুবিধা আছে কিছু? আপনি করেন না?

আমি চুরি করি?

মালিকের পান্থ নিবাসতো ফাঁকা করে দিচ্ছেন।

রশীদ মিয়ার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এলো।

কে, কে বলেছে?

বলা বলিরতো কিছু নেই। সবাই জানে। সাধুজীতো পরিষ্কার বলেছেন, তীক্ষ্ণ চিবুক, ছোট কান এবং বর্তুলাকার চক্ষুর জাতক চোর স্বভাববিশিষ্ট হয়।

নিশানাথ এই কথা বলে?

হ্যাঁ বলবেনা কেন? সাধুজী স্পষ্ট কথার লোক।

এরপর আর আমার নাম ধাম খাতায় তুলতে অসুবিধা হয় না। রশীদ মিয়া গম্ভীর গলায় উপদেশও কিছু দেন, 'ঘরে মেয়ে ছেলে আনতে পারবেন না। ভদ্রলোকের মেস এইটা। ধান্ধাবাজির জায়গা না। বিশিষ্ট লোকজন থাকে।'

অগ্রিম এক মাসের খাওয়া খরচের টাকা দেয় সফিক। তারপর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রশীদ মিয়ার পেটে হাত দিয়ে বলে, 'মাশআল্লাহ্ পেটতো আপনার আরো পাঁচ গিরা বড় হয়ে গেছে রশীদ মিয়া।' সফিককে যতই দেখি ততই অবাক হই। এ কোন সফিক? দু'বৎসরে তার এ কি পরিবর্তন!

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল একবার। দেখি ঘরের মধ্যে লালচে আলো। সমুদ্র গর্জনের মত শোঁ শোঁ আওয়াজ হচ্ছে। ধর মড় করে জেগে উঠে দেখি সফিক স্টোভ জ্বালিয়েছে।

কি ব্যাপার সফিক?

ব্যাপার কিছু না, চা খাব।

চা এই সময়? কয়টা বাজে?

তিনটা দশ। তুই খাবি নাকি?

না।

রোজ এই সময় চা খাস নাকি?

না দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙ্গলো, ভাবলাম একটু চা খাই।

আমি চুপ করে থাকলাম। সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল,

বড় স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছি জানিস না বোধ হয়?

আমি জানতাম না। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কি করে পড়ব বল? দিনে কম্পোজিটারের চাকরী। বিকালে টিউশনি আছে দুটো। এর পর আর এনার্জি থাকে না। নাইট কলেজে পাস কোর্সে নাম তোলা আছে। এই বছর আর হবে না।

সফিক দুটি কাপে চা ঢাললো। আমি বললাম,

এত রাতে চা খাবনা সফিক।

তোর জন্যে না, নিশানাথকে ডেকে আনছি।

কিছুক্ষণ পরই নিশানাথ জ্যোতির্যাণবের গজগজানি শোনা গেল, রাত দুপুরে চা? এই সব কি শুরু করেছ? যাও চা খাবনা।

সফিকের গলা আরেক ধাপ উঁচুতে,

বানানো হয়েছে চা খাবেন না মানে? খেতেই হবে।

আরে হুকুম নাকি তোমার?

একশ বার হুকুম? বানালাম এত কষ্ট করে আর তিনি খাবেন না। আলবত খাবেন।

সফিকের কান্ড কারখানা দেখে আমি স্তম্ভিত। জ্যোতির্যাণব অবশ্যি খড়ম খট খট করে ঘরে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন, চা কোথায়? ওয়াক থু। এতো ইঁদুর মারা বিষ।

সফিক সে কথার উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ চাপ থেকে শান্ত স্বরে বলল,

একটা গল্প বলুন নিশানাথ বাবু।

জ্যোতির্যাণব চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন,

কি হয়েছে তোমার?

কিছু হয় নাই।

না বল কি হয়েছে?

সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল,

একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমার ছোট বোন অনু মরে পড়ে আছে। সাত আটটা কাক তার পাশে বসে আছে।

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন,

শেষ প্রহরের স্বপ্ন। তার উপর এখন শুক্ল পক্ষ—স্বপ্নের কোনই মানে নাই। নাক ডাকিয়ে ঘুমাও।

একেবারে যে মানে নাই তা না নিশানাথ বাবু। অনুর হাসবেন্ডটা আরেকটা বিয়ে করছে। সোমবার চিঠি পেয়েছি। মনটা বড় অস্থির। সন্ধ্যাবেলা আপনার সঙ্গে

খারাপ ব্যবহার করেছি, কিছু মনে করবেন না। আমার মাথা ঠিক নাই। নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। চা শেষ করে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমি শুয়েই ছিলাম, ঘুম আসছিল না। সফিক জেগে রইল অনেকক্ষণ।

এই সফিক কি যে ক্যাবলা ছিল। একা একা স্কুলে আসতে ভয় পেত বলে রোজ তার বাবা স্কুলে দিয়ে যেতেন। টিফিনের সময় আমরা সবাই যখন ছুটাছুটি করে কুমীর কুমীর খেলি, তখন সে উদাস চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অংক স্যার একদিন রেগে গিয়ে বললেন,

সবাই খেলছে আর তুই বসে আছিস? রহমান যাতো ওর কান মলে দে।

রহমান আমাদের ক্লাস ক্যাপটেন। সে গিয়ে কান চেপে ধরতেই সফিকের নিঃশব্দ কান্না। আমরা হেসে বাঁচিনা। একদিন সফিকের বাসায় গিয়ে দেখি তার মা ভাত মেখে খাইয়ে দিচ্ছেন। ক্লাস ফোরে পড়ে ছেলে, মায়ের হাত ছাড়া খেতে পারে না। কি কান্ড কি কান্ড!

আমার ঘুম ভাঙ্গলো খুব সকালে। বাইরে এসে দেখি একটি লোক হাফ পেন্ট পড়ে উঠ বস করছে। আমাকে দেখে সে মনে হল একটু লজ্জা পেল। ইতস্তত করে বলল,

সফিক সাহেবের বন্ধু আপনি?

জ্বি।

আমি আজীজ। রেলে চাকরী করি। শরীরটা ঠিক রাখতে হয় ভাই। যা খাটনি।

আমি কিছু বললাম না। আজীজ সাহেব গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন,

আপনার মত রোগা পটকা হলে এত দিনে যক্ষা হয়ে মরে যেতাম। শরীরের জন্যে টিকে আছি। ওয়াগন বুকিং-এর চাকরী যে করে সেই জানে।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম লোকটির স্বাস্থ্য সত্যি ভাল। সচরাচর এমন চোখে পড়ে না। আমি হাসি মুখে বললাম,

বেশ স্বাস্থ্য আপনার।

আর স্বাস্থ্য। খাওয়া জুটাতে পারি না ভাই। শুধু ভিজা ছোলা খেয়ে কি স্বাস্থ্য হয়? সারাক্ষণ ক্ষিদে লেগে থাকে। আসলাম পালোয়ান সকাল বেলা দশটা ডিম আর এক সের গোস্তের কিমা খায়। এই সব জিনিস পাব কোথায় বলেন?

আজীজ সাহেব আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন বেলের সরবত খাওয়ার জন্যে। এতে নাকি পেট ঠান্ডা থাকে। আজীজ সাহেবের ঘরটি বেশ বড়। তিনি এবং করিম সাহেব দু'জনে মিলে থাকেন। করিম সাহেব লোকটি কংকালসার। মাথায় কোন চুল নেই। কিন্তু মুখ ভর্তি প্রকান্ড গোঁফ।

করিম সাহেব ইনি সফিক ভায়ের বন্ধু, এখানে থাকবেন।

করিম সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে নিচে নেমে গেলেন। তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল তার পরই। করিম সাহেব বাঁশীর মত চিকন গলায় চিৎকার করছেন,

এত বড় বালতিটা চোখে পরলনা?

বালতির মধ্যে নাম লেখা আছে, যে দেখলেই চিনব?

টেরা টেরা কথা বললেন না।

টেরা কথা কে বলে, আমি না আপনি?

যত ছোট লোকের আড্ডা হয়েছে।

মুখ সামলে কথা বলবেন সাহেব।

একজন অতি বৃদ্ধ লোক দেখলাম, কি বলে যেন দু'জনকেই থামাতে চেষ্টা করছেন। আজীজ সাহেব বললেন,

উনি নবী সাহেব। গার্লস স্কুলের এ্যাসিসটেন্ট হেড মাষ্টার ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। অবস্থাটা দেখেছেন? রাতে চোখে একেবারেই দেখতে পান না। হাত ধরে বাথরুমে নিতে হয়।

উনি নাকি ঘর ছেড়ে দিবেন, সফিক বলল।

আজীজ সাহেব গলা নিচু করে বললেন,

পাগল হয়েছেন, শিকড় গজিয়ে গেছে। এই ঘর ছেড়ে যাবেন না কোথাও। দুই মেয়ে থাকে ঢাকায়–জামাইরা বড় চাকুরে, তারা নেবার চেষ্টা কম করে নাই, নিজের চোখে দেখা। ছোট মেয়েটার কত কান্না কাটি–।

নবী সাহেব ঝগড়াটা থামিয়ে ফেললেন। তারপর নিচু গলায় ডাকতে লাগলেন, 'এই কাদের। এইকাদের।' কাদের এই মেসের বাবুর্চি টাবুর্চি হবে। সে এসে হাত ধরে তাঁকে উপরে নিয়ে এল। আজীজ সাহেব ফিস ফিস করে বললেন,

বুড়ার দিন শেষ হয়ে আসছে। হাঁপানি আছে, ডায়াবেটিস আছে, সারারাত খক খক করে কাশে। কিন্তু তেজ কি— মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে থাকবেনা। এত তেজ ভাল না রে ভাই! এখন আরাম নেয়ার সময়, কি বলেন?

তাতো ঠিকই।

বুড়া হলে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু থাকেনা।

সফিক ঘুম থেকে উঠে অন্য মানুষ। হাসি খুশী ভাবভঙ্গি। চা খেতে খেতে বলল,

তোর কোন চিন্তা নাই, প্রাইভেট টিউশনি ঠিক করে রেখেছি। সপ্তায় পাঁচ দিন যাবি। চোখ বন্ধ করে কলেজে ভর্তি হয়ে যা। শ'চারেক টাকাও জমিয়েছি। অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া আরেকটা বুদ্ধি বের করেছি।

কি বুদ্ধি?

ছুটির দিনে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করব। তুইও থাকবি।

সেটা কি রকম ব্যবসা?

সস্তা দরে দোকান থেকে কাটা কাপড়ের পিস কিনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিক্রি করব। লাভের ব্যবসা। লালু সব ঠিক ঠাক করে দিবে।

লালু কে?

কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। ধুরন্ধর লোক। আমাকে খুব খাতির করে।

আমি হাসি মুখে বললাম,

তুই বদলে গেছিস খুব।

সফিক ঘর ফাটিয়ে হা হা করে হাসতে লাগলো।

বদলাবনাতো কি? তুই ও বদলাবি। দু'বেলা না খেয়ে থাকলেই সব উলট পালট হয়ে যায় বুঝলি। একদিন তো রাস্তায় সূঁচ বিক্রি করলাম। মজার ব্যাপার খুব।

সফিক সিগারেট ধরিয়ে ফুস ফুস করে টানতে লাগলো। ওর আগের সেই সুন্দর চেহারা আর নেই। চোখের নিচে কালি পড়েছে, গালের চোয়ালে উঁচু হয়ে সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ হয়ে পড়েছে। সফিক হাসি মুখে বললো,

সূঁচ বিক্রির গল্পটা শোন। একেবারে মরণ দশা তখন। চাকরী বাকরী কিছুই নেই। হাতে জমানো টাকা পয়সা যা ছিল সব শেষ। পুরা একটা দিন উপোস। দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। সন্ধ্যাবেলা বেরিয়েছি রাস্তায়। এম্নি সময় এক লোক এসে বললো,

সূঁচ নিবেন ভাই? ছয়টা চাইর আনা। আমি অবাক হয়ে বললাম,

সূঁচ বিক্রি করে চলে তোমার? সেই লোক আমতা আমতা করে 'না স্যার চলে কই? ঘরে চারজন খানেওয়ালা।' সেই রাত্রেই শুরু হল আমার সূঁচের ব্যবসা। মূলধন যোগাড় করলাম জ্যোতির্ষাণবের কাছ থেকে। খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ টাকার সূঁচে দশটাকা লাভ।

লজ্জা লাগত না তোর?

না লজ্জা লাগবে কেন?

পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয় নাই?

বেশি দিন সূঁচ বিক্রি করলে হয়তো হত। বেশি দিন করি নাই। তবে আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন। পেছন থেকে চিনতে পারিনি। যথারীতি বলেছি, 'আপা সূঁচ নেবেন, সস্তা করে দিচ্ছি।' মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না। শেষটায় বলল, 'কাল সন্ধ্যায় একবার আমার বাসায় আসবেন? আসেন না। ঠিকানা রাখেন। আসবেন কিন্তু।'

গিয়েছিলি?

গেলাম। রাজপ্রাসাদের মত বাড়ী। দেখলেই বুকের মধ্যে হু হু করে। মেয়েটিকে দেখে কে বলবে ওদের এত পয়সা। দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি সেই রাত্রেই কম্পোজিটারের একটা চাকরী যোগাড় করে দিল। প্রেসের মালিককে কি বলেছিল কে জানে, যাওয়া মাত্র এক মাসের এডভান্স বেতন।

মেয়েটাতো খুব ভাল।

হু ভাল মেয়ে। তোকে একদিন নিয়ে যাব।

সফিককে নিয়ে সেই দিনই কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলেজের প্রিন্সিপাল গম্ভীর মুখে বললেন,

তিন বছর লস দিয়েছ দেখছি। এই তিন বৎসর করেছ কি?

কান টান লাল হয়ে গেল আমার। নিজের অভাব অনটনের কথা আমি নিজে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারিনা।

পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কিছু বইপত্র যোগাড় করলাম। যে বাড়ীতে প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় হয়েছে সে বাড়ীতেও সফিক আমাকে নিয়ে গেল। নয় দশ বছরের একটি মেয়ে আর ক্লাস ওয়ানের একটি ছেলেকে পড়াতে হবে। এদের মা নেই। বাবা ব্যস্ততার মধ্যে সময় করতে পারেন না। ভদ্রলোক বললেন, 'দুটিই ভীষণ শয়তান, অস্থির হয়ে পড়েছি আমি। দেখেন ভাই যদি কিছু করতে পারেন।' বাচ্চা দু'টিকে ভালো লাগলো। ছোটটি দেখি একটি পেনসিল দিয়ে বোনকে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করছে। বড়টির মুখের ভাব এরকম যে এই সব ছেলেমানুষী ব্যাপার দেখে সে বড়ই বিরক্ত। বাচ্চা দুটির খুব মায়া কাড়া চেহারা।

পান্থ নিবাসে ফিরে এলাম অনেক রাতে। জ্যোতির্ষাণবের ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, তাঁর মোটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, 'আপনার রবির ক্ষেত্রে ত্রিশুল চিহ্ন আছে। অতি শুভ লক্ষণ। হাজারে একটা পাওয়া যায়না। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্র ভাল না। গ্রহ কুপিত হয়েছেন।'

আজীজ সাহেবের ঘরে হৈ হৈ করে তাস খেলা হচ্ছে। তীক্ষ্ণ গলায় কে যেন চেঁচাচ্ছে, 'এটা নো ট্রাম্পের কল? মাথার মধ্যে কিছু আছে আপনার? গোবর পুরা মাথায় অফিসের কাজকর্ম করেন কি ভাবে?'

বারান্দায় পাটি পেতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন করিম সাহেব। কাদের তার গায়ে তেল মাখাচ্ছে। আরামে চোখ ছোট হয়ে আসছে করিম সাহেবের। আমাদের দেখে টেনে টেনে বললেন, 'তেল মালিশের মত উপকারী কিছু নাই। দুইটাই চিকিৎসা আছে, 'জল চিকিৎসা আর তেল চিকিৎসা।'

পান্থ নিবাসে আমার জীবন শুরু হল। ১১ই মার্চ উনিশশো পয়ষট্টি সন।

॥ তিন ॥

বাড়ী থেকে চিঠি এসেছে।

বাবা এবং মা দু'জনেই দু'টি পৃথক খামে চিঠি দিয়েছেন। বাবার চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে চিঠিতে নিজের ছেলে মেয়ের কথা কিছুই নেই। স্টেশন মাস্টার এবং পোস্ট মাস্টারের কথা বিশদভাবে লেখা। বাবা লিখেছেন,

> বেহালার দাম কত তা নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়াছ। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবে এবং রেজিস্টারী চিঠি দিয়া আমাকে জানাইবে । এদিকের খবর ভাল তবে স্টেশন মাস্টার সাহেবের বড় বিপদ। তাঁর চাকরী নিয়া ঝামেলা হইতেছে। হেড অফিস হইতে ইন্সপেকশন হইবে। বড় উদ্বিগ্ন আছি। আমাদের পোস্টমাস্টার সাহেবের মেজো মেয়ের বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে। ছেলে কাস্টমসে চাকুরী করে। তিনশত পঁচাত্তর টাকা বেতন। পনরই ফাল্গুন ইনসাল্লাহ্ বিবাহ, দেনা-পাওনা নিয়ে ছেলের এক মামার সহিত কিঞ্চিৎ মনো- মালিন্য হইয়াছে। মামাটি অতি অভদ্র। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব।

মায়ের চিঠিটাও ছোট। আমার পড়াশুনা নিয়ে উদ্বেগ। স্বাস্থ্য কেমন আছে। এখানকার খাওয়া দাওয়া কেমন, এইসব। কিন্তু শেষের দিকে লিখেছেন,

> তোমার বাবার স্বাস্থ্য বিশেষ ভালনা। খাওয়া দাওয়ায় ইদানীং খুব অনিয়ম করেন। আমার সন্দেহ হয় তাহার অল্প অল্প মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। পরে বিস্তারিত লিখিব।

চিঠি পড়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা নিশ্চয়ই অনেক কিছু গোপন করেছেন। খুব অস্থির লাগলো। সফিকের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু সে আসবে রাত এগারোটার দিকে। বারান্দায় চেয়ার টেনে চুপচাপ বসে রইলাম। চার পাঁচ মাসে বাবার এমন কি হতে পারে যাতে মা ভেবে বসেছেন বাবার মাথার দোষ হয়েছে। তা ছাড়া সংসার চলছে কি ভাবে সেই প্রসঙ্গেও কেউ কিছু লিখেন নাই। জমির আয় অতি সামান্য। মামারা মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এখনো করছেন কিনা কে জানে? পারুলের স্কুলের বেতন দেয়া হয়েছে কি? না নাম কাটিয়ে বাড়ীতে বসে আছে। কিছু দিন আগে পারুলের চিঠি পেয়েছি সেখানে এসব কিছুই লেখা নাই। বাড়ীর জন্য বড় মন কাঁদতে লাগলো।

জ্যোতির্বাণবের কাছে একটু যে বসব সে উপায় নেই। তাঁর নাকি আবার কি এক মৌনব্রত শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহ কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। হাত দেখাতে যারা আসছে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সফিক মৌনব্রতের প্রথম দিন চেঁচিয়ে বলেছে,

শুধু ভড়ং, রোজগার পাতি নাই কিনা তাই একটা নতুন ফিকির বের করেছে।

এর উত্তরে জ্যোতির্বাণব শ্লেটে বড় বড় করে লিখেছেন, মৌনব্রত অবস্থায় আমাকে রাগাইও না।

সেই শ্লেট রেখে এসেছেন সফিকের বিছানায়। সফিক রেগে মেগে অস্থির। তার এরকম রাগের অর্থও ঠিক বুঝতে পারি না। রোজগার বাড়াবার ফন্দিই যদি হয় তাতে ক্ষতি কি? ফন্দি ফিকিরতো সবাই করে। তা এমনিতেও তার খুব তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে। কোন কারণ ছাড়াই রেগে উঠে। করিম সাহেবের সঙ্গে অকারণে একটা ঝগড়া করল। করিম সাহেব রোজকার মত সন্ধ্যা বেলা গায়ে তেল মাখাচ্ছিলেন। সাফিক গম্ভীর হয়ে বলল,

এই কুৎসিত অভ্যাসটা ছাড়েন দেখি।

আপনারতো কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

ঘরের সামনে একটা লোক নেংটা হয়ে তেল মাখায়—এটা সহ্য করা যায়না।

আমি নেংটা হয়ে তেল মাখাই । আমি ?

তুমুল হৈ চৈ বেঁধে গেল। নবী সাহেব এসে থামালেন।

সফিকের প্রেসের চাকরিটা নাই। কি নিয়ে গোলামাল করেছে কে জানে? লালুর সঙ্গে কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে। সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। সন্ধ্যার পর যায় বয়স্কদের কি একটা স্কুলে। এই চাকরিটি সে কি করে যেন ধাঁ করে যোগাড় করে ফেলেছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মাসে তাকে একশ টাকা করে যাতায়াত খরচ দেয়। এর বিনিময়ে বস্তির লোকদের সে বর্ণ পরিচয় পড়ায়। এই চাকরিতে সে খুব সন্তুষ্ট। হাসি মুখে আমাকে বলে,

সব গুন্ডা পান্ডাদের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে রে। অনেকেই আমার ছাত্র কিনা। খুব মানে। দেখবি ওদের দিয়ে 'নিউ প্রেসের' মালিককে রাম ধোলাই দিব একদিন। আর আমাদের রশীদ মিয়াকেও।

রশীদ মিয়া আবার কি করেছে?

মস্ত বড় চোর। দেখনা কি করি শালাকে।

আমার মনে হয় সফিকের কোন একটা অসুখ করেছে। রাতে তার ভাল ঘুম হয়না- ছট্ ফট্ করে। প্রায়ই দেখা যায় অন্ধকার ঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করছে।

রাতের বেলা তার চা খাওয়ার সঙ্গী নিশানাথ বাবু। দুজনে চুক চুক করে অন্ধকারে চা খায়–আবার ঝগড়াও করে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি পড়াশুনা করতে। কিন্তু কিছুতেই মন বসেনা। ক্লাশে বড্ড ঘুম পায়। প্রফেসররা এক ঘেঁয়ে সুরে কি বলেন তাঁরাই জানেন। একেক সময় এমন নির্বোধ মনে হয় তাদের। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যাই সদরঘাট। লঞ্চ টার্মিনালের কাছে সফিক লালুকে নিয়ে কাটা কাপড় বিক্রি করে। জায়গাটা নাকি ভাল। ঘরে ফেরা মানুষেরা বেশি দরদাম করেনা। ঝটপট কিনে ফেলে। আমাকে দেখলেই সফিক বিরক্ত হয়। গম্ভীর হয়ে বলে, 'ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আসলি? মুশিবত দেখি ।' ক্লাসে যেতে সত্যি আমার ভাল লাগেনা। কলেজের ছেলেগুলিকে আপন মনে হয়না কখনো। অনেক বেশি ভাল লাগে পান্থনিবাসের লোকজনদের। এদের সাথে আমার পরিচয় অল্পদিনের–তবু মনে হয় যেন কত কালের চেনা। সিরাজ সাহেবের কথাই ধরা যাক। বয়সে আমার চেয়ে দশ বারো বৎসরের বড়। কিন্তু আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন আমি তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু । পঁয়ত্রিশের মত বয়স হয়েছে। বিয়ে করেছেন মাত্র গত বৎসর। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই লাজুক ভঙ্গিতে বলেন,

শুধু পয়সার অভাবে দেরী করলাম। কিন্তু বড় বেশি দেরী করে ফেলেছি। বউটার বয়স অল্পরে ভাই। মনে মনে বোধহয় কষ্ট পায়–বুড়ো হাসবেন্ড।

সিরাজ সাহেব প্রতি শনিবারে দেশে যান। সোমবার সকালে এসে অফিস ধরেন। শুক্রবার বিকালে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হয় আমাকে। খুঁটিনাটি কত কি যে দরদাম করেন। মুখে কপট বিরক্তির রেখা।

বুঝলেন ভাই বিয়ে করার যন্ত্রণা! বাজারে ঘুরতে ভাল লাগে বলেন দেখি? গতবার যে নিয়ে গেলাম লাল ফিতা? পছন্দ হয় নাই। রঙটা নাকি কটা। মেয়েদের মনের ঠিক পাওয়া মুশকিল রে ভাই।

সিরাজ সাহেবের বৌটির আবার গল্পের বই পড়ার নেশা। মাঝে মাঝেই বই নিয়ে যাওয়ার ফরমাশ থাকে। বইয়ের দোকান ঘুরতে ঘুরতে ঘাম বেরিয়ে যায় আমার, বই আর সিরাজ সাহেবের পছন্দ হয় না। যে বই দেখানো হয়, সিরাজ সাহেব ঘাড় নাড়েন–'উহুঁ' মলাটে এইটা পাখির ছবি নাকি? এই বই ভাল হবে কী করে ভাই? একটা ট্র্যাজিক বই দেখান না।'

এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস কেনার কথা মনে হয় সিরাজ সাহেবের। একবার কিনবেন সন্দেশ তৈরীর ছাঁচ। সদরঘাট আর নিউ মার্কেট চষে ফেললাম দুজনে—কোথাও পাওয়া যায় না। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে পাংশু।

খুব করে বলে দিয়েছে নিতে। সখ হয়েছে একটা, ছেলেমানুষতো। শেষ পর্যন্ত চক বাজারে পাওয়া গেলো। সিরাজ সাহেবের গাল ভর্তি হাসি যেন গুপ্তধন পেয়েছেন।

রাতে টিউশনি থেকে ফিরার পর সিরাজ সাহেব একবার আসবেনই আমার ঘরে। হাসি মুখে বলবেন, 'বারান্দায় হাওয়ার মধ্যে খানিকক্ষণ বসবেন নাকি রঞ্জু ভাই? পড়াশুনার ক্ষতি হলে থাক।'

আমি রোজই গিয়ে বসি। এ কথা সে কথার পর সিরাজ সাহেব এক সময় বৌয়ের কথা এনে ফেলেন।

কোয়ার্টার পেলে নিয়ে আসতে হবে। ছেলেমানুষ, একা একা থাকতে পারে বলেন দেখি? তার উপর তার আবার ভূতের ভয়।

শিগগীরই পাবেন কোয়ার্টার?

অফিসার্স গ্রেডে গেলেই পাব। সুন্দর কোয়ার্টার। বেড রুম দুইটা। বারান্দা আছে। ফুলের টব রাখা যায়। আপনার ভাবীর আবার গাছের শখ।

তাই নাকি?

আর বলেন কেন! গাছের নামে অজ্ঞান। এইবার হুকুম হয়েছে রজনী গন্ধার চারা নিতে হবে। বিয়ে করার যে কি ঝামেলা, বিয়ে না করলে বুঝবেন না।

সিরাজ সাহেব কপট বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করতে চেষ্টা করেন। বারান্দার আবছায়া অন্ধকারেও কিন্তু তাঁর হাসিমুখ ঢাকা পড়েনা। বড় ভালো লাগে আমার।

একবার ভাবীকে দেখতে যাব আমি আপনার সঙ্গে।

অবশ্যই অবশ্যই। এই শনিবারেই চলেন। কি যে খুশী হবে। না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। ওর কাছে আপন পর কিছু নাই– সবাই আপন। যেতে হবে কিন্তু ভাই, ছাড়বনা আমি।

শনিবারে কিন্তু সিরাজ সাহেব যেতে পারলেন না। অফিসের কাজ পরে গেল হঠাৎ করে। মুখ কালো করে ঘুরতে লাগলেন। রাতে খেতে পারলেন না। মোটেই নাকি খিধে নেই। রোববার ভোরে দেখি তার চোখ বসে গেছে। দিশেহারা ভাব। সারারাত নাকি ঘুম হয়নি। খুব আজে বাজে স্বপ্ন দেখেছেন,

দেখেছেন যেন একটা মস্ত বড় সাপ রেখাকে ছোবল দিচ্ছে। মনটা বড় অস্থির ভাই। চলেন দেখি নিশানাথের কাছে যাই।

নিশানাথ গম্ভীর মুখে শুনলেন সব কিছু। তাঁর ভাব দেখে মনে ভরসা পাওয়া যায়না। কিন্তু কথা বললেন খুব নরম গলায়,

দুশ্চিন্তাগ্রস্থ মনতো–তাই এই সব দেখেছেন। এই সব কিছু না। শনিবারতো এলো বলে। বড় সাহেবকে বলে এইবার একদিন বেশি থেকে আসবেন।

কিন্তু পরের শনিবারে সিরাজ সাহেবকে অফিসের কাজে খুলনা চলে যেতে হল। সোমবার সন্ধ্যায় ফিরলেন। আমরা সিরাজ সাহেবের দিকে তাকাতে পারিনা। নবী সাহেবের মত মানুষ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,

দেশে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। চিন্তা করবেতো।

সিরাজ সাহেব দার্শনিকের মত মুখ করে বললেন,

টেলিগ্রাম আর করে কি হবে?

পান্থ নিবাসের জীবনযাত্রা খুব এক ঘেঁয়ে বলেই বোধ হয়। সোমবার ভোরে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সবাই অবাক হয়ে দেখলাম রিকশা থেকে একটি ফুট ফুটে মেয়ে নামছে। এমন মায়া কাড়া চেহারা। হলুদ রঙের একটি শাড়ীতে দারুণ মানিয়েছে। যদিও কেউ আমাকে কিছু বলেনি তবু বুঝলাম এই মেয়েটিই সিরাজ সাহেবের বৌ। একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল আমাদের মধ্যে। নিশানাথ জ্যোতির্ষার্ণব সিরাজ সাহেবকে ভাই বলে ডাকেন। তিনি অবলীলায় বলতে লাগলেন,

এসো মা এসো। আসবে সিরাজ। যাবে কোথায়? অফিসের কাজে আটকা পড়ে যেতে পারেনি। আজও সকাল সকাল চলে গেছে। এক্ষুণি আনতে লোক যাবে।

সিরাজ সাহেবের বৌটি অল্প সময়ের মধ্যে সহজ হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু এবং নবী সাহেব দুজনকেই সে এমন সুরে চাচাজান ডাকতে লাগলো যেন বহু দিন পর হারানো চাচা ফিরে পেয়েছে। নবী সাহেব দুবার রান্নাঘরে গিয়ে তদারক করলেন নাস্তাপানি কি দেয়া হবে। সফিক চলে গেল সিরাজ সাহেবের অফিসে। করিম সাহেব গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলেন, আজ আর তিনি অফিসে যাবেন না। দুপুরের খাবারটা যেন ভাল হয় সেটা দেখা শোনা করা দরকার। কাদেরের উপর ভরসা করা যায় না। মেয়েটি মনে হল অভিভূত হয়ে পড়েছে। সে কখনো ভাবেনি এমন একটা সমাদর তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সবার সঙ্গে সে এমন ভাব করতে লাগলো যেন সেই পান্থ নিবাসে দীর্ঘদিন ধরে আছে। এখানকার সবাই তার চেনা।

সফিক সিরাজ সাহেবকে সঙ্গে করে এগারোটার দিকে এলো। সিরাজ সাহেবকে কিছুই বলেনি সে। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তিনি কাঁপা গলায় বললেন,

আমার নাকি দুঃসংবাদ আছে?

জ্যোতির্ষাণবের দাড়ির ফাঁকে হাসি খেলে গেল। তিনিও যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বললেন,

যান দেখি সাহেব আমার ঘরে। দুঃসংবাদতো আছেই। ঘরে গিয়ে বসেন ঠান্ডা হয়ে, বলছি।

সিরাজ সাহেব ঘরে ঢুকতেই ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে ফেলা হল। জ্যোতির্ষাণবের হাতে তালা মজুদ ছিল। তালা লাগিয়ে দেয়া হল দরজায়। আমাদের সমবেত হাসির শব্দে রাস্তায় লোক জমে গেল।

রাতের বেলা খেতে গিয়ে দেখি ফিস্টের ব্যবস্থা। এ মাসের বাজারের ভার আজীজ সাহেবের হাতে। তিনি কাউকে না জানিয়ে ফিস্টের ব্যবস্থা করেছেন। বাকি মাস সাবধানে বাজার করে তিনি নাকি সব পুষিয়ে নেবেন।

পান্থ নিবাসে নিজেদের দুঃখ কষ্ট আমরা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। তবু একেক বার মন ভেঙ্গে যেতে চায়। বাড়ীর চিঠি পড়ে আমার আজ বড় কষ্ট হচ্ছে। হাতে একেবারেই টাকা পয়সা নেই। থাকলে আজ রাতেই বাড়ী চলে যেতাম। প্রাইভেট মাষ্টারীটা ভাল লাগছেনা। ভদ্রলোক কিছুতেই টাকা দিতে চান না। বেতন দেবার সময় হলেই অম্লান বদনে বলেন,

এই মাসে একটা ঝামেলা আছে–সামনের মাসে নেন।

পরের মাসেও তাঁর হাতে টাকা থাকেনা। অল্প কিছু দিয়ে বলে,

বাঁকি টাকাটা দিন সাতেক পরে চেয়ে নেবেন।

দিন সাতেক পর টাকা চাইলে মহা বিরক্ত হয়ে বলেন,

মাসের মাঝখানে আমি টাকা পাই কোথায় বলেন দেখি? বিচার বিবেচনাতো কিছু আপনার থাকা দরকার।

পড়াবার সময় কাছে বসে থাকেন। বাচ্চা দুটি এক সময় ঘুমে ঢুলতে থাকে। আমি উঠতে চাইলেই গম্ভীর হয়ে বলেন,

এখনই উঠবেন কি দশটাতো বাজে নাই! হাতের লেখাটা আর একবার লেখান।

বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে চোখে পানির ঝাপ্টা দিয়ে আবার এনে বসান। মেয়েটি করুণ চোখে তাকায় আমার দিকে। বড় মায়া লাগে।

সফিকের সঙ্গে কথা বলে মাষ্টারীটা ছেড়ে দিতে হবে। ওর সঙ্গে দিনের বেলা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে রাতে নাইট কলেজে পড়ব। সফিকের যদি লজ্জা না লাগে আমার লাগবে কেন? বাড়ীতে সাহায্য করতে হবে।

আজ আর পড়াতে না গিয়ে সফিকের জন্যে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রইলাম। করিম সাহেব আজও গায়ে তেল মেখে বারান্দায় মাদুরের উপর শুয়ে আছেন। আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন,

নিশানাথের মাথায় এক বালতি ঠান্ডা পানি ঢাললে দেখবেন, মৌনব্রত কোথায় গেছে। ফর ফর করে কথা বলবে বুঝলেন, এসব ধাপ্পাবাজি আমার কাছে চলবেনা।

আমি চুপ করে রইলাম। করিম সাহেব বললেন,

আরে ভাই লোক চড়িয়ে খাই, আমার সঙ্গে চালাকি? মৌনব্রতের পাছায় লাথি।

সফিক ফিরল অনেক রাতে। চোখে মুখে দিশেহারা ভাব। গায়ে আকাশ পাতাল জ্বর। জ্যোতির্ষাণব তার গায়ে হাত দিয়েই মৌনব্রত ভেঙ্গে ফেললেন, চেঁচিয়ে বললেন,

পানি ঢালতে হবে মাথায়। আর ডাক্তার লাগবে একজন।

সফিক চিঁ চিঁ করে বললো,

ডাক্তার দেখিয়েই এসেছি। প্রেশক্রিপসন লিখে দিয়েছে, টাকা থাকলে অষুধ আনান। আমার কাছে নাই কিছু।

জ্বর বাড়তেই থাকলো। সফিক আরক্ত চোখে নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বললো,

আয়ু রেখাটা দেখেন দেখি ভাল করে। এত সকাল সকাল মরলে হবে না। কাজ অনেক বাকী আছে।

নবী সাহেব, আজীজ সাহেব, করিম সাহেব সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়াল। আমি জ্বরের গতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য শেষ রাতের দিকে ঘাম দিয়েই জ্বর ছেড়ে গেল। সফিক ভাল মানুষের মত উঠে বসে বললো,

ক্ষিধে লেগেছে, কি খাওয়া যায় বলেন দেখি নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন,

বড্ড ঝামেলা হয়ে গেছে রঞ্জু। ভয়ের চোটে মানত করে ফেলেছিলাম। আজ রাতে জ্বর কমলে কাল দুপুরেই কাঙালী ভোজন করাব। হাতে পয়সা কড়ি মোটেই নাই। এদিকে জ্বরতো দেখি কমেই গেছে। তারা মা ব্রহ্মময়ী একি বিপদে ফেললে আমাকে!

॥ চার ॥

শীতের শুরুতে বাবা এসে হাজির।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারামুখে। গায়ে একটা ময়লা কোট। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। চেনা যায় না এমন।

মায়ের চিঠিতে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা যে এতটা কল্পনাও করিনি। নিচের পাটির একটি দাঁত পড়ে গিয়ে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে!

ও রঞ্জু কেমন আছিস তুই? কতদিন পর দেখলাম।

আমি অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। বার বার মনে হল বাবার মাথার দোষটা হয়তো সেরে গেছে। না সারলে এতদূরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এলেন কি করে? তবু সন্দেহ যায় না। বার বার জিজ্ঞেস করি,

মাকে বলে এসেছেন তো বাবা? না বলে আসিনিতো?

বাবা পরিষ্কার কোন উত্তর দেননা। একবার বলেন,

হ্যাঁ বলেছিতো। আবার বলেন,

বলব কি করে ? তোর মা কথা বলে না আমার সঙ্গে। ভাত খাওয়ার সময় আমি সামনে থাকলেও বলে, পারুল তোর বাবাকে খেতে বল।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবাকে লক্ষ্য করি। কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক। আমার পরীক্ষা কবে, পড়াশুনা কি রকম করছি, এই সব খুব আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলেন।

রাতে হোটেলে ভাত খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। সারাপথ গল্প করতে করতে চললেন। এখন আর গল্পের ধরন সে রকম স্বাভাবিক মনে হল না। যেন নিজের মনেই কথা বলছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,

বাড়ীর সবাই ভাল আছেন বাবা?

বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,

হ্যাঁ সবাই ভাল। ষ্টেশন মাষ্টারের ছোট ছেলেটার হুপিং কফ হয়েছে।

পারুল, পারুল কেমন আছে? তাঁর পরীক্ষা কবে?

জানিনাতো। ভালো আছে নিশ্চয়ই।

আমি অবাক হয়ে বলি,

পারুল কেমন আছে জানেন না বাবা? কি বলেছেন এসব?

কি করে জানব, বোকার মত কথা বলিস? পারুলের বিয়ে হয়ে গেছেনা?

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি। এসব কি শুনছি?

কি বলছেন আপনি? কিসের বিয়ে?

গত শুক্রবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তোর মার এমন ত্যাজর ভ্যাজর – পুলিশে খবর দাও, পুলিশে খবর দাও। মেয়ে ছেলেদের বুদ্ধিতো।

আমি বেশ খানিকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলামনা। ভাবতেও পারছিলামনা কেন তারা আমাকে একটা খবর জানানোর প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করলনা।

ছেলেটা ভাল। বেশ ভাল। পারুলকে নেত্রকোনায় নিয়ে গেছে। আমি ওদের সঙ্গে গৌরীপুর পর্যন্ত গেলাম। আমার টিকিট লাগেনা। ট্রেনের চেকাররা সবাই আমাকে চিনে। খুব খাতির করে।

বাবার কথা বার্তা শুনে চোখে পানি এসে গেল আমার। পারুলের মত মেয়ে এই করবে? পনের বছর যার বয়স! 'খবর দিলেন না কেন বাবা? একটা টেলিগ্রামতো করতে পারতেন।' বাবা শান্ত স্বরে বললেন,

তোর মা বলল, টেলিগ্রাম করলে শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তা হবে। আমি চিঠি লিখব। মেয়ে মানুষের এরচে বেশি বুদ্ধি কি হবে? হলেতো আর মেয়েছেলে থাকতোনা পুরুষই হয়ে যেত।

মায়ের চিঠি পৌছবার আগেই পারুলের চিঠি এল। নেত্রকোনা থেকে লিখেছে। লম্বা চিঠি। কিন্তু কোথাও নিজের বিয়ের কথা কিছু নেই। একবারও লিখেনি যে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। তার দীর্ঘ চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে, বাড়ীর অবস্থা খুব খারাপ। মামারা টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করেছেন। আমি যেন যে ভাবেই হোক প্রতি মাসে মাকে টাকা পাঠাই। প্রয়োজন হলে কলেজ ছেড়ে দিয়েও যেন একটা চাকরি যোগাড় করি। বড় ডাক্তার দেখিয়ে যেন অতি অবশ্যি বাবার ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা,

দাদা দেখবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকে আমার উপর রাগ হলেও—সেদিন আর রাগ থাকবেনা।

মায়ের চিঠিটি পাঁচ পাতার। ব্যাপারটি কি ভাবে ঘটল তা নিখুঁত ভাবে লেখা। বৃহস্পতিবার সারাদিন পারুল নাকি শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে। মাকে বলেছে পেটে প্রচন্ড ব্যথা। শুক্রবার সকালে পরিষ্কার দেখে একটা শাড়ী পরে অঞ্জুকে পুকুর ঘাটে নিয়ে একটি টাকা দিয়ে বলেছে ইচ্ছেমত খরচ করতে। মা একবার খুব ধমক দিলেন। পরিষ্কার শাড়ীটা নষ্ট করছে সেই জন্যে। পারুল কিছু বলে নাই। দুপুরে খাওয়ার পর মাকে গিয়ে বলেছে, 'মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে বড্ড মাথা ধরেছে। মা ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন পারুল ঘরে নেই।———'

সফিক সব কিছু শুনে বললো,

তোর বোনটার তাহলে বুদ্ধি আছে দেখি?

বুদ্ধির কি আছে এর মধ্যে?

বিয়ে করে নিজে বেঁচেছে তোদেরও রিলিফ দিয়েছে।

পরক্ষণেই সে পারুল প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, প্রতি মাসে তোর মাকে টাকা পাঠাতে হবে। এইটি খুবই জরুরী। আমি অবাক হয়ে বললাম, কোত্থেকে পাঠাব? টাকা কোথায়? সবাই মিলে একটা চায়ের স্টল দিয়ে ফেলি আয়। খোঁজ নিয়েছি ভাল লাভ হবে। ম্যানেজার করে দেব নিশানাথকে। নিশানাথের দাড়ি গোঁফ দেখেই দেখবি হুড় হুড় করে কাষ্টমার আসবে। চা বানিয়ে কূল পাওয়া যাবে না।

বলে কি সফিক। নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব চায়ের দোকান দেবে? সফিককে দেখে মনে হল তার মাথার প্ল্যান খুব পাকা।

কাটা কাপড়ের ব্যবসাটা মাঠে মারা গেছে। ভাত খাওয়ার পয়সা নাই লোকে কাপড় কিনবে কি?

আমি বললাম,

জ্যোতির্ষাণব বুঝি চায়ের দোকান খুলবে তোর সাথে?

না খুলে যাবে কোথায়? একটা লোক আসেনা তার কাছে। ব্যাটার এখন ধূপ কেনার পয়সা নাই।

সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলো। যেন খুব একটা হাসির ব্যাপার হয়ে গেছে।

জ্যোতির্ষাণবের এমন দুর্দিন যায়নি কখনো। সঞ্চয় যা ছিল উড়ে গেছে। শখের টেবিল ফ্যানটি বিক্রি করেছেন করিম সাহেবের কাছে। আমাকে গম্ভীর হয়ে বললেন,

সাধু সন্ন্যাসী মানুষদের জন্যে এই সব কিছু দরকার নাই। আমাদের কাছে হিমালয়ের গুহাও যা আবার সাহারা মরুভূমিও তা ফ্যানের কোন প্রয়োজন নাই।

মিল চার্জ বাকি পড়ায় গত শনিবার থেকে খাওয়া বন্ধ। পরশু দুপুরে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি একটা শুকনো পাউরুটি চিবোচ্ছেন। আমাকে দেখে দারুণ লজ্জা পেয়ে গেলেন। কান টান লাল করে বললেন,

আমিষ বর্জন করলাম রঞ্জু। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত গূঢ় বিদ্যার চর্চা করলে মাছ মাংসে সমস্ত বর্জন করতে হয়। আমার ঠাকুর দা শ্রী শ্রী তারানাথ চক্রবর্তী সমস্ত দিনে এক মুঠি আলো চালের ভাত আর একবাটি দুধ খেতেন। কি বিশ্বাস হয়? আমিষ একবার বর্জন করে দেখ শরীর ঝর ঝরে হয়ে যাবে।

রশীদ মিয়া উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। নিশানাথ বাবুর নাকি তিন মাসের সিট রেন্ট বাকি। জ্যোতির্ষাণব শুনলাম অতি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলছেন,

আর একটি মাস রশীদ মিয়া। এর মধ্যেই আমার মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করবে। রবির ক্ষেত্র আবার—

আরে রাখেন সাহেব মঙ্গল আর রবি। পনেরো দিন সময়। এর মধ্যে পারেন দিবেন না পারেন বিস্‌মিল্লাহ বিদায়। তিন মাসের সিটরেন্ট আপনার দেওয়া লাগবেনা।

জ্যোতির্ষাণবের এমন খারাপ সময় যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাঁকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা যাবেনা। দান এবং ঋণ গ্রহণ, এই দুই জিনিস নাকি তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ। সফিক সবার সঙ্গে পরামর্শ করে 'বাংলা দৈনিক' সব কটিতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিল। একদিন পর পর সে বিজ্ঞাপন ছাপা হল এক সপ্তাহ পর্যন্ত।

> পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত জ্যোতিষ—
> শ্রী নিশানাথ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ষাণব। এম. এ. (ফলিত
> গণিত) বহু রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। আসুন
> পরীক্ষা করুন দর্শনী নামমাত্র।

নিশানাথ বাবু বিজ্ঞাপন দেখে খুবই রেগে গেলেন। সফিককে গিয়ে বললেন, 'এম. এ. (ফলিত গণিত) এটা কোথায় পেলে? মিথ্যাচার করা হল। উফ কি তঞ্চকতা।' সফিক বললো,

সবটাইতো তঞ্চকতা নিশানাথ বাবু। সবটাই যখন মিথ্যার উপর কাজেই মিথ্যাটাকে আরেকটু বাড়ানো হল।

হাজার বৎসরের পন্ডিতদের সাধানালব্ধ জ্ঞান সবই মিথ্যা ?

নিতান্ত মূঢ়ের মত কথা বার্তা। জ্ঞানহীন মূর্খের বাচালতা।

"হিম কুন্দ মৃণালাভং দৈত্যাং পরং গুরু,
সর্ব্ব শাস্ত্র প্রবক্তা ভার্গবং।।"

অং বং করে লাভ কিছু নাই নিশানাথ বাবু। এসব এখন ছাড়ার সময় এসে পড়েছে।

এত করেও নিশানাথ বাবুর অবস্থা ফেরানো গেলনা। ঢাকা শহরের সব লোক হঠাৎ হাত দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে কি না কে জানে। এমন খারাপ অবস্থা হবে জ্যোতির্ষাণবের স্বপ্নেও ভাবিনি। একদিন অনেক ভণিতা করে সফিককে বললেন,

আমার একটা ভাল ঘড়ি আছে। এক ভক্ত দিয়েছিল। শুধু শুধু পড়ে আছে কোন কাজে লাগেনা।

কাজে লাগেনা কেন?

এই সব কল কব্জার ঘড়িতে কি আমাদের হয়? আমাদের দরকার বালি ঘড়ি কিংবা সূর্য ঘড়ি। সেই সব ঘড়িতে পল অনুপল এই সব হিসাবও সূক্ষ্ম ভাবে করা যায়। পল বুঝতো ? পল হচ্ছে এক দন্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ।

সফিক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। জ্যোতির্ষাণব হাসি মুখে বলে চলেন—তাই ভাবলাম কাজে যখন লাগেনা তখন আর ঘড়ি রেখে লাভ কি? রোজ চাবি দেয়া যন্ত্রণার এক শেষ। সফিক তুমি ঘড়িটা নিয়ে বিক্রি করে ফেল। সফিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

বিক্রি করে ফেলব?

হাঁ। সাধু সন্ন্যাসী মানুষ আমি, এই সব বিলাস সামগ্রী দুই চোখে দেখতে পারিনা। তান্ত্রিক সাধনাতে মোহ মুক্তির প্রয়োজন সবচে বেশি। তোমরা এই সব বুঝবে না। বিষয়ী লোকদের বোঝা খুব মুশকিল।

জ্যোতির্ষাণব পকেট থেকে ভেলভেটের বাক্সে সযত্নে রাখা হাত ঘড়িটি বের করে টেবিলে রেখেই দ্রুত চলে গেলেন। বেশ ভাল ঘড়ি সেটি। সফিক ঘড়ির বাক্স হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বললো,

ব্যাটারতো খুবই খারাপ অবস্থা রঞ্জু। ঘড়িটা তাঁর খুব শখের। সফিক চিন্তিত মুখে ঘড়ি হাতে বেরিয়ে গলে।

জ্যোতির্ষাণবের ভাগ্য বদলালো দুপুরের একটু পর। সম্ভবত মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করেছে, রবির ক্ষেত্র আবার ঠিক ঠাক হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম প্রকান্ড একটি সাদা রঙ্গের গাড়ী এসে থামলো পান্থ নিবাসের সামনে। গাঢ় নীল রঙ্গের শাড়ী পরা একটি মেয়ে সেই গাড়ী থেকে নেমে সোজা উঠে এসেছে পান্থ নিবাসের দোতলায়। সাধুজী নিশানাথ জ্যোতির্ষাণবের খোঁজ করছে সেই মেয়ে। আমাদের মধ্যে সাড়া পরে গেল। রশীদ মিয়া পর্যন্ত একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল। অনেকদিন পর জ্যোতির্ষাণবের ভারী গলা পাওয়া গেল,

অতি সুলক্ষণা মেয়ে মা তুমি, অতি সুলক্ষণা। চন্দ্র ও রবির মিলিত প্রভাব, কেতুর মঙ্গলে অবস্থান। এরকম হয়না, খুব কম দেখা যায়। হুঁ হুঁ। বিদ্যা ও ধন। লক্ষ্মী–স্বরস্বতী এক মালায় গাঁথা। বড় ভাগ্যবতী তুমি।

যাবার সময় সেই মেয়ে একশ টাকার দুটি নোট দিয়ে জ্যোতির্ষাণবের কন্ঠরোধ করে দিল। নিশানাথ বাবু দু'মাসের সিট রেন্ট মিটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধূপ কিনে আনলেন। অনেক দিন পর তাঁর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বললো, ধূপ পুড়তে লাগলো। করিম সাহেব একবার অবাক হয়ে বললেন,

এক কথায় দুশো টাকা দিয়ে দিল। পাগল নাকি মেয়েটা?

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন,

দুশো টাকা খুব বেশি লাগলো আপনার কাছে? হাজার টাকা নিয়েও মানুষ একদিন আমাদের সাধা সাধি করেছে। টাকা অতি তুচ্ছ জিনিস মশাই আমাদের কাছে।

অনেক দিন পর জ্যোতির্ষাণব মেসের এক তলায় সবার সঙ্গে খেতে গেলেন। মাছের তরকারীতে নুন কম হয়েছে কেন তাই নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করলেন কাদেরের সঙ্গে।

সফিক সন্ধ্যাবেলা এসে জিজ্ঞেস করলো, আভাকে আসতে বলেছিলাম— এসেছিল? আমি অবাক হয়ে বললাম,

আভা কে?

ঐ যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম, চাকরি দিয়েছিল আমাকে। আসে নাই?

এসেছিল।

বলেছিলাম আজকেই আসতে। টাকা পয়সা কত দিয়েছে জানিস নাকি? একশো টাকা দিতে বলেছিলাম।

দুশো টাকা দিয়েছে।

মেয়েটার নজর খুব উঁচু। সাধু ব্যাটা কিছু বুঝতে পারে নাই নিশ্চয়ই।

আমি কিছু বললাম না। সফিক হাসি মুখে বললো,

যাক ঘড়িটি বিক্রি করতে হয় নাই। নিশানাথের খুব শখের ঘড়ি।

সফিক ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে প্রচন্ড ঝগড়া বাঁধিয়ে বসলো। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া। নিশানাথ বাবু সফিককে হাসতে হাসতে বলছেন, 'আমার কেতু এবং মঙ্গলের যে দোষটা ছিল সেটা কেটে গেছে সফিক। হুড় হুড় করে টাকা আসা শুরু হয়েছে। তোমার দরকার হলে বলবে লজ্জার কিছু নাই।'

সফিক বলেছে,

এইসব ধাপ্পাবাজী এখন ছাড়েন নিশানাথ বাবু। অনেকতো করলেন।

নিশানাথ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

পুত্রবৎ জ্ঞান করি তোমাকে আর তোমার মুখে এত বড় কথা। রাগের মাথায় ব্রহ্মশাপ দিয়ে ফেলব সফিক।

এ আমার দুর্বাশা মুনি। ব্রহ্মশাপ দেবেন।

খবর্দার বলছি। খবর্দার। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

হাতাহাতি হয়ে যাবার মত অবস্থা।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে শুনি চুক চুক শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারে বসে তিনমূর্তি চা খাচ্ছে। সফিক, জ্যোতির্ষাণব আর আমার বাবা। ফিস্ ফিস্ করে তাদের মধ্যে কি সব কথা বার্তাও হচ্ছে। বাবা এখানেই আছেন, কিছুতেই ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। রাত্রে জ্যোতির্ষাণবের ঘরে গিয়ে ঘুমান। দিনের বেলাটা কাটান সফিকের ঘরে। আমি দেশে ফেরানোর কথা বলে বলে হার মেনেছি। সফিক অবিশ্যি বলছে, 'থাকুন না তিনি। মেডিকেলে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাটা করি আগে।'

মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা অনেক কথা বার্তা বলেও কোন অসুখ বিসুখ ধরতে পারলেন না। রাগী চেহারার একজন বুড়ো মত ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন,

অসুবিধাটা কি আপনার বুঝতে পারছিনাতো।

বাবা বললেন, 'অসুবিধাতো কিছু নাই ডাক্তার সাহেব।'

রাত্রে ঘুম হয়?

ঘুম হবেনা কেন?

বাবা মহাসুখেই আছেন। পান্থ নিবাসের সবার সঙ্গেই তাঁর খাতির। আজীজ সাহেব সকাল বেলা ব্যায়াম করেন। তিনি বসে থাকেন পাশে। আমাকে প্রায়ই বলেন,

রঞ্জু স্বাস্থ্য হচ্ছে সমস্ত সুখের মূল। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখা দরকার। তুই বেলের শরবত খাবি। খুব উপকারী। আজীজ বলেছে আমাকে।

বাবার সবচেয়ে বেশি খাতির সিরাজ সাহেবের সঙ্গে। সিরাজ সাহেব কোন এক বিচিত্র কারণে বাবাকে পছন্দ করেন। অফিস থেকে এসেই তিনি বাবাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেন। তারপর দরজা বন্ধ করে গুজ গুজ করে আলাপ। এক শনিবারে বাবা সিরাজ সাহেবের সঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। আমি কিছু বললাম না। পরের শনিবারে দেখি আবার যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছেন। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। বাবা শান্ত স্বরে বললেন,

আমার জন্যে বৌটা কৈ মাছ যোগাড় করে রাখবে বলেছে—না গেলে কেমন করে হয়?

কৈ মাছ খাওয়ার জন্য এত দূর যাবেন?

নারিকেলের চিড়া করে রাখবে। এখন না যাই কি করে?

এইবার ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেন অত্যন্ত রহস্যময় একটি ব্যাপার তিনি জেনে ফেলেছেন। ব্যাপারটি দুদিন পর

আমরাও জানলাম। রাতের খাওয়ার পর বাবা আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ের ছবি সফিকের টেবিলের উপর রেখে গম্ভীর হয়ে সফিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সফিক অবাক হয়ে বললো,

এ ছবি কার? আর এই মেয়েটিই বা কে?

বাবা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,

রেবার ছবি।

রেবা? রেবা কে?

যেই হোক তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

সফিক এবং আমি দুজনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। বাবা নিজেই খোলসা করেন,

রেবা হচ্ছে সিরাজ সাহেবের বোন। ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করে এসেছি। পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি।

সফিকের চেয়ে বেশি হকচকিয়ে যাই আমি। বাবার যে কি সব লোক হাসানো কান্ড কারখানা। সফিক কিন্তু সহজ ভাবেই বলে,

পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন চাচা?

হ্যাঁ তা বলতে গেলে দিয়েই ফেলেছি। তোমার বাবা বেঁচে নাই। আমাকেই তো দেখতে হবে সব। ঠিক কিনা তুমিই বল?

তা ঠিক।

বাবা মহা উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হাসি হাসি মুখ। তোমাকে ওদের খুব পছন্দ। সিরাজের বৌ এখানে এসে দেখে গেছে তোমাকে। বড় ভাল মেয়ে বড় ভাল। সফিক চুপ করে থাকে। বাবা উৎসাহে এবং উত্তেজনায় ছট্ ফট্ করতে থাকেন।

তোমাদের বিয়ের পর আমি কিন্তু তোমাদের বাসাতেই থাকব। রেবাকেও বললাম এই কথা।

সফিক আঁতকে উঠে বলে, 'তাকেও বলেছেন এই কথা?'

বলবনা কেন? সংসারের মাথাতো মেয়েরাই হয়। হয় না?

তা হয়।

আমার ধারণা ছিল সফিক রেগে মেগে একটা কান্ড করবে। বাবাকে নিয়ে আমি মহা লজ্জায় পড়ব। সে রকম কিছু হলনা। সে যেন লজ্জায় পড়েই উঠে গেল সামনে থেকে।

আমি পরের সপ্তাহেই বাবাকে টেনে তুলে দিয়ে আসলাম। ঢাকায় রেখে চিকিৎসাও কিছু হচ্ছেনা। শুধু শুধু টাকা নষ্ট। মা একটির পর একটি উদ্বিগ্ন চিঠি পাঠাচ্ছেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে দেখি সিরাজ সাহেব আজীজ সাহেব আর আমাদের জ্যোতির্বাণব এসে হাজির। তারা বিদায় জানাতে এসেছন। আজীজ সাহেবের হাতে আবার প্রকান্ড একটা খাবারের ঠোঙ্গা। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছেলে মানুষের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কি যে অস্বস্তিকর অবস্থা!

॥ পাঁচ ॥

মা'র নামে একশ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। আমার আর্থিক টানাটানি কিছু দূর হয়েছে। কলেজে বেতন মাফ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা একটা ভাল টিউশনি যোগার হয়েছে। ক্লাস নাইনের একটি মেয়েকে সপ্তাহে চার দিন পড়াই। মেয়েটি খুবই শান্ত স্বভাবের। বড়ই লাজুক। সারাক্ষণ মুখ নিচু করে পড়ে। যদি কিছু জিজ্ঞেস করি বইয়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। মুখ তুলে তাকায়না। পড়ানো শেষ করে যখন যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াই তখন লাজুক মুখে বলে, 'স্যার একটু বসেন।'

মেয়েটি দ্রুত চলে যায় ভেতরে । ফিরে আসে বরফ দেয়া এক গ্লাস পানি এবং ঝক ঝকে একটি কাঁচের বাটিতে কিছু খাবার নিয়ে। বিকালে আমার কিছুই খাওয়া হয়না। ক্ষিধায় নাড়ি মোচড় দিতে থাকে। লোভীর মত খাবারটা খাই। মেয়েটা নরম গলায় বলে, 'স্যার আরো খানিকটা আনি?' আমার লজ্জা লাগে তবু অপেক্ষা করি খাবারের জন্যে। মাসের এক তারিখে মেয়েটি অতি সংকোচে টাকা দেয় আমার হাতে । যেন স্যারকে টাকা দেয়াটা একটা লজ্জার ব্যাপার। এত ভাল লাগে আমার। মাঝে মাঝে ছোট খাটো দু একটা উপহার কিনে আনতে ইচ্ছা হয়। সাহস হয়না হয়ত মেয়েটির মা কিছু মনে করবেন। মেয়ের মা কখনো আমার সামনে আসেন না। পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কথা বলেন,

শেলী অংকে খুব কাঁচা। দেখবেন ভাল করে।

জ্বি দেখব।

বাড়ীর কাজ ঠিকমত করেনা। ধমক দিবেন। আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে শুধু ফাঁকি দিচ্ছে বোধহয়।

মেয়েটির বাবার সঙ্গে দেখা প্রায় হয় না বললেই হয়। তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত। যখন হঠাৎ এক আধদিন দেখা হয় তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন,

চিনতে পারলামনাতো। কে আপনি?

আমি সসংকোচে বলি, আমি শেলীর মাষ্টার।

তাইতো তাইতো। আমি গত সপ্তাহেইতো দেখলাম। একটুও মনে নাই। লজ্জার ব্যাপার।

ভদ্রলোক দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,

মাষ্টার সাহেবকে চা দেয়া হয়েছে? আফজাল আফজাল।

চা খেয়েছি আমি।

তাতে কি আরেকবার খাবেন। আপনি নিজেওতো ছাত্র?

জ্বি।

শেলী বলেছে আমাকে। একটিই টিউশনি আপনার?

আমার দারুণ লজ্জা লাগে। কান টান লাল করে বলি,

বিকালেও একটা টিউশনি আছে।

আমি নিজেও খুব কষ্ট করে পড়েছি। তিন চারটা টিউশনি করতাম। একটুও ভাল লাগতো না। সারাক্ষণ ভাবতাম কখন তারা চা টা খেতে দিবে। আপনাকে চা টা ঠিকমত দেয়তো?

হা হা করে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। বেশ মানুষ। হাসি থামতেই গম্ভীর হয়ে বললেন,

এক বাড়ীতে পড়াতাম একটা ছেলেকে। মহা মূর্খ। তিনবার ফেল করেছে মেট্রিক—দেখেন অবস্থা। একেক বার ফেল করত আর ছেলের বাবা এসে আমাকে ধমক ধামক—কেন ফেল করল, কেন ফেল করল।

আমার মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ আছে। সব সময় নিজেকে ছোট মনে হয়। কলেজে সসংকোচে থাকি। একেক দিন সফিকের সঙ্গে তার কাটা কাপড়ের স্তূপের কাছে যেতে হয়। টাকা পয়সা গুনে গুনে রাখতে আমার কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। সব সময় মনে হয় এই বুঝি ক্লাসের কোন ছেলে বলে বসবে, কে রঞ্জুনা? কিন্তু এই বাড়ীতে এসে সেই ভাবটা আমার থাকেনা। শেলী যেদিন জিজ্ঞেস করল,

স্যার আপনি ফুটপাতে কাপড় বিক্রি করেন?

তখন কেন জানি আমার লজ্জা লাগলনা। আমি খুব সহজ ভাবেই বললাম,

হ্যাঁ। আমার বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে যাই। তুমি জানলে কি করে?

আমি হঠাৎ দেখলাম।

তোমার খারাপ লাগছিল নাকি?

নাতো! মজা লেগেছে।

মেয়েটিকে দেখলেই পারুলের কথা মনে হয়। কোথায় যেন পারুলের সঙ্গে এর মিল আছে। স্পষ্ট কোন মিল নয় এক ধরনের সূক্ষ্ম অস্পষ্ট মিল।

অনেক দিন পারুলের কোন খোঁজ খবর জানিনা। একবার শুনেছিলাম তারা নাকি নেত্রকোনা থেকে বরিশাল চলে গেছে। নেত্রকোনায় শ্বশুর বাড়ীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। বরিশালের ঠিকানা জানা না থাকায় চিঠিও দিতে পারি না। অনেকদিন পারুলকে দেখিনা। শুধু পারুল কেন মা'র সঙ্গেও দেখা নাই অনেকদিন। যেতে আসতে অনেকগুলি টাকা খরচ হয়। প্রাণে ধরে এতগুলি টাকা খরচ করতে পারিনা।

পান্থনিবাসে এক ঘেঁয়ে জীবন কাটাই। সফিক সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তার দেখা পাওয়া যায়না। অনেক রাতে ঘরে ফিরেই ঘুমুতে শুরু করে। সফিকের সেই মাষ্টারীটা আর নাই। কাটা কাপড়ের ব্যবসা আবার শুরু করেছে। মনেহয় খুব একটা সুবিধা করতে পারছেনা। তার স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে গেছে। ঘুমের মধ্যে ছট্ ফট্ করে। কে জানে বড় ধরনের কোন অসুখ নিশ্চয়ই বাঁধিয়েছে। রাতের বেলা হঠাৎ জেগে ওঠে বলে, 'শীত লাগছে রঞ্জু জানালাটা বন্ধ করতো।' ভাদ্র মাসের পঁচা গরমে তার শীত লাগে কেন কে জানে?

মাঝে মাঝে হঠাৎ সফিককে খুব খুশী খুশী লাগে। ফূর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলে, 'এইবার বিয়ে করে ফেলব। দুজন থাকলে যুদ্ধে অনেক এডভানটেজ পাওয়া যায়। অভাবের সঙ্গে কি আর একা একা ফাইট চলে?'

রেবার ছবিটি বের করা হয় তখন। সফিক লাজুক স্বরে বলে,

বেশ মেয়েটি কি বলিস? ভাল মানুষের মত দেখতে। কিন্তু রঞ্জু এই মেয়ের অনেক বুদ্ধি। দেখ চোখের দিকে তাকিয়ে।

সফিক রেবার ছবিটি যত্ন করে একটা খামে ভরে রাখে। সেই খামটি তার টিনের ট্রাঙ্কে তালাবন্ধ থাকে। সফিকের লজ্জা টজ্জা একটু কম কিন্তু রেবার প্রসঙ্গ উঠলেই সে কেমন যেন লজ্জা পায়। সে প্রসঙ্গ ওঠে কম। আমি নিজে থেকে কখনো তুলিনা। নিশানাথ বাবু অনেকবার বলেন, সিরাজ সাহেবের বোনের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করা দরকার। ভাল মেয়ে দেবী অংশে জন্ম। এই সব মেয়ে হাত ছাড়া করা ঠিকনা। বলতে বলতে আড় চোখে তাকান সফিকের দিকে । সফিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে,

বিয়ে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এতদিনে?

জিজ্ঞেস করব সিরাজ সাহেবকে ?

না না থাক।

নিশানাথ বাবু গম্ভীর হয়ে বলেন,

এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে আর অসুবিধা কি?

সফিক চুপ করে থাকে। নিশানাথ বাবু বলেন,

বড়ই বোকামী করছ সফিক। তোমার হচ্ছে স্ত্রী-ভাগ্যে উন্নতি। কথাতো শুনবেনা কিছু।

নিশানাথ জ্যোতির্ষাণবের দিনকাল বড়ই খারাপ। লোকজন হাত দেখাতে আসে কালে ভদ্রে। পান্থনিবাসের টাকা আবার বাকি পড়ে। রশীদ মিয়া রোজ

সকালে টাকার জন্যে তাগাদা দিতে আসে। সরু চোখে তাকিয়ে থেকে হিস হিস করে কথা বলে,

ঘর কবে ছাড়বেন বলেন দেখি? আবার তিন মাসের বাকি।

জ্যোতির্ষাণব মুখ নিচু করে থাকেন। কোন কোন দিন রশীদ মিয়ার গালাগালি চরমে ওঠে, 'আর একমাস দেখব তারপর বিসমিল্লাহ ইক্কু টাইট দিব বুঝছেন। সোজা আঙ্গুলে না হলে আঙ্গুল বেকা করা লাগে।' জ্যোতির্ষাণব কিছুই বলেন না। নবী সাহেব মৃদু গলায় বলেন, এই সব কি বলেন রশীদ মিয়া? মানুষের অভাব হয় না। এই সব কথা বলা কি ঠিক?'

ঠিক বেঠিক জানিনা। আমার কথা পরিষ্কার। আমি কি দানসাগর খুলেছি নাকি? না এটা সাধুজীর বাপের হোটেল?

করিম সাহেবের সঙ্গে জ্যোতির্ষাণবের মোটেই মিল নেই। জ্যোতি-র্ষাণবের কোন একটা ঝামেলা হলে করিম সাহেবের আনন্দে দাঁত বের হয়ে যায়। সেই করিম সাহেবও একদিন রেগে গেলেন,

এইটা কি কাণ্ড রোজ রোজ, ভদ্রলোকের অপমান।

রশীদ মিয়া চোখ লাল করে বলল,

ভদ্রলোকটা কে? আমিতো কোন ভদ্রলোক দেখিনা।

চুপ শালা। তোমাকে আজ আমি ভদ্রলোক গিলায়ে খাওয়াব।

রশীদ মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুকনা গলায় বলল,

আপনে এই সব কি বলছেন করিম সাহেব?

চুপ একদম চুপ। শালা তোমার পাছায় লাথ্থি মেরে পাইখানার মধ্যে তোমারে কূপে ফেলব। ভদ্রলোক চিনবা তখন। হৈ চৈ শুনে নিচ থেকে কাদের মিয়া ছুটে এল। নবী সাহেব বের হয়ে আসলেন। জ্যোতির্ষাণব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন,

থামেন করিম সাহেব। কি সব বলছেন।

আপনে থামেন। আমি থামার লোক না। শালাকে খুন করে ফাঁসি যাব আমি।

করিম সাহেব লোকটিকে আমি কোনদিনই পছন্দ করি নাই। করিম সাহেব এমন লোক, যাকে কোন কারণেই পছন্দ করা যায় না। পান্থনিবাসের কেউ তার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলেনা। কিন্তু সেই রাতে সিরাজ সাহেব তাঁকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর আজীজ সাহেব তাঁকে তাস খেলার জন্যে ডাকতে আসলেন। নবী সাহেবের মেয়ের বাড়ী থেকে ডিমের হালুয়া এসেছিল। নবী সাহেব সেই হালুয়ার বাটি পাঠিয়ে দিলেন করিম সাহেবের ঘরে। সবাইকে ভাগ করে দেয়ার দায়িত্ব করিম সাহেবের।

॥ ছয় ॥

জ্যোতির্ষাণব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

রাত আটটায় ফিরে এসে দেখি নিশানাথ বাবুর ঘর খালি। চৌকিটা বাইরে টেনে এনে রাখা হয়েছে। রশীদ মিয়া চৌকির উপর গম্ভীর হয়ে বসে সিগারেট টানছে। কাদের বালতি বালতি পানি এনে ঘরের মেঝেতে ঢালছে এবং ঝাঁটা দিয়ে সশব্দে ঝাঁট দিচ্ছে। ছুটির দিনবলেই মেসে লোকজন কেউ নেই। নবী সাহেবও মেয়ের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছেন। নয় নম্বর ঘরে যে ছেলেটি থাকে শুধু তার ঘরে বাতি জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে বললাম,

কি ব্যাপার রশীদ সাহেব?

কিসের কি ব্যাপার?

সাধুজী কোথায়?

চলে গেছে।

কোথায় চলে গেছে?

আমি কি জানি কোথায় গেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন?

কখন গেছেন?

দুপুরে।

হঠাৎ চলে গেলেন যে?

কি মুশিবত আমি তার কি জানি। যেতে চাইলে আমি ধরে রাখব নাকি? শ্বশুর বাড়ী এইটা?

আমি বেশ অবাক হলাম। নিশানাথ বাবু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে চলে যাবেন এটা ভাবা যায়না। তা ছাড়া তাঁর যাওয়ার কোন জায়গাও সম্ভবত নাই। কে জানে হয়ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা হয়ত চায়ের দোকানে বসে আছে একা একা। আমি কাপড় না ছেড়েই চায়ের দোকানে চলে গেলাম। না সেখানে সাধুজী যাননি। রাস্তার মোড়ে যে ছেলেটি পান সিগারেট বিক্রি করে সে বললো—সাধুজী স্যুটকেস হাতে নিয়ে উত্তর দিকে গেছেন। তার দোকান থেকে দু প্যাকেট ষ্টার সিগারেট কিনেছেন।

মেসে ফিরে যেতেই নয় নম্বরের ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। এই ছেলেটি এক পত্রিকার অফিসে কাজ করে। তার সব সময় নাইট ডিউটি। সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘুমায়, কারো সঙ্গে কথা বার্তা বলেনা। মেসে সে খায় না। ছুটি ছাটার দিন তার কেরোসিন চুলায় নিজেই দেখি রান্না করে। আমাকে দেখেই ছেলেটি বলল,

সফিক সাহেব কখন ফিরবেন?

জানিনা কখন।

সফিক সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কি ব্যাপার?

ছেলেটি আড় চোখে রশীদ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল,

আসেন আমার ঘরে বসি। আপনিতো আসেন নাই কখনো। আমি নিজেই অবশ্যি কাউকে বলিনা। আমার একা একা থাকতে ভালো লাগে। সিঙ্গেল রুম নিয়েছি এই জন্যে।

তার ঘর নবী সাহেবের ঘরের মতো গোছানো। দেখেই মনে হয় নারীর স্পর্শ আছে। দেয়ালে আবার নীলরঙ্গা একটি তৈলচিত্র। জ্যোৎস্না রাত্রির ছবি। অসম্ভব সুন্দর এই ছবিটি ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। তাকালেই মন বিষণ্ন হয়।

আমার ছোট ভাইয়ের আঁকা। আর্ট কলেজে পড়ে ফোর্থ ইয়ার। আপনি কি চা খাবেন? চায়ের ব্যবস্থা আছে।

না চা খাবনা আমি, ভাত খাই নাই এখনো। আপনি কি জন্যে ডাকছিলেন।

ছেলেটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

সাধুজী আজ দুপুরে আমার কাছে একটি ঘড়ি রেখে গেছেন সফিক সাহেবকে দেয়ার জন্যে। খুব দামী ঘড়ি।

আমি চুপ করে রইলাম। ছেলেটি বলল,

তিনি যাওয়ার সময় কাঁদছিলেন। আমার এমন খারাপ লাগলো বুঝলেন! বিকালে এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, যাই নাই দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম।

আমি বললাম, 'আপনার নাম আমি জানিনা। কি নাম ভাই?'

সুলতান। সুলতান উদ্দিন। সাধুজী ছাড়া কেউ আমার নাম জানেনা। কারো কাছে যাইনাতো। সাধুজীর কাছে একবার গিয়েছিলাম। মনটা খুব খারাপ সেই সময়। হঠাৎ গেলাম। তিনি অনেক কথা বললেন এখনো মনে আছে।

কি বললেন?

এই সান্ত্বনার কথা আর কি! অন্য রকম করে বললেন। সান্ত্বনার কথা বলাতো খুব কঠিন। সবাই বলতে পারে না। খুব হৃদয়বান মানুষ লাগে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম তার ঘরে। কথা বার্তা না—চুপচাপ বসে থাকা। ছেলেটি একেবারেই কথা বার্তা বলে না যতবার বললাম,

উঠি? ততবারই বলে, বসেন না আরেকটু বসেন। সফিক সাহেব আসলে যাবেন।

রাত এগারোটা পর্যন্ত সফিকের জন্যে অপেক্ষা করে খেতে গেলাম। এত রাত পর্যন্ত কাদের থাকেনা। টেবিলে ভাত তরকারী ঢেকে রেখে ঘুমাতে যায়। কিন্তু আজ দেখি জেগে আছে। ভাত তরকারী বাড়তে বাড়তে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'হুনছেন স্যার? করিম সাব মাল খাইছে আইজ।'

কি বললি?

মাথা ফাট্টি নাইন। বমি কইরা ঘর ভাসাইয়া দিছে। আমারে সাফ করতে কয়। আমি কইছি মাল খাওয়া বমি আমি সাফ করিনা। ভদ্রলোকের ছেলে আমি কি কন স্যার? অন্যায় কইলাম।

উপরে উঠেই করিম সাহেবের সঙ্গে দেখা। বারান্দায় রাখা চৌকির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আমাকে দেখেই মাথা তুলে বললেন,

সাধুজী চলে গেছে শুনেছেন? শালা রশীদ মিয়ার পেটে আমি একটা তিন নম্বরী চাকু যদি না ঢুকাই তাহলে আমি বেজন্মা কুত্তা। শালার মাকে আমি—।

করিম সাহেব অনর্গল কুৎসিত কথা বলতে লাগলেন। তারপর এক সময় হড় হড় করে বমি করে ফেললেন।

আপনার কি শরীর খারাপ করিম সাহেব?

না শরীর ঠিকই আছে। শালার সস্তার তিন অবস্থা। সস্তা জিনিস খেয়ে এখন মরণ দশা। ছয় টাকা করে বোতল বুঝলেন? বলতে বলতে আবার বমি।

সফিক আসলো বারোটার দিকে। নিশানাথ বাবু চলে গেছেন এই খবরে তার কোন ভাবান্তর হল না। ভেলভেটের বাক্সে মোড়া ঘড়ি ফেলে রাখল টেবিলের এক কোণায়। তার ভাবভঙ্গি এ রকম যেন নিশানাথ বাবুর ঘর ছেড়ে যাওয়া তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। রোজই এরকম হয়। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় বলল,

চায়ের দোকান স্টার্ট দিয়ে দিব এইবার। খোঁজ খবর শুরু করেছি। দু হাজার টাকা সেলামী দিলে শ্যামলীতে একটা ঘর পাওয়া যায়। ভাল ঘর। আভাকে বলব টাকাটা ধার দিতে।

দিবে সে?

দিবে নিশ্চয়ই। আর না দিলে কি আছে, ছোট করে শুরু করব। নবী সাহেবকে বলব কিছু দিতে।

নবী সাহেব অবশ্যি দিবেন।

সবাই দিবে। দেখিস না কি করি।

আমি বললাম, 'শুধু আমাদের ম্যানেজারই নেই।'

সফিক কোন উত্তর দিল না। বাতি নিবিয়ে মশারী ফেলে শুয়ে পড়ল। বাইরে করিম সাহেব মস মস করে হাঁটতে লাগলেন। বমি টমি করলে শুনেছি মাতালদের নেশা কেটে যায়। কিন্তু রাত যত গভীর হচ্ছে করিম সাহেবের নেশাও মনে হয় ততই গাঢ় হচ্ছে।

তিনি উঁচু গলায় বলছেন,

ভয় পাওয়ার লোকনা আমি। কাউকে ভয় পাই না। লাথ দিলে সব ঠিক ঠাক। এমন লাথ ঝাড়ব পাছায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিব।

এক সময় সফিক বিরক্ত হয়ে বলল,

ঘুমাতে যান করিম সাহেব।

কেন? তোমার হুকুম নাকি? আমি কি তোমার হুকুমের গোলাম?

চুপ করেন করিম সাহেব।

তুই চুপ কর শালা।

সফিক আর কথা বাড়াল না। আমার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসলা না। এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। বুঝতে পারছি সফিকও জেগে আছে। সফিক একবার ডাকলো,

জেগে আছিস নাকি রঞ্জু?

আমি জবাব দিলাম না। বাইরে করিম সাহেবেরও আর কোন সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সফিক এক সময় মশারীর ভেতরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে খক খক করে কাশতে লাগলো। অন্ধকার ঘরে একটা লাল ফুলকি উঠানামা করছে। দেখতে দেখতে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙ্গলো শেষ রাত্রে। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির ছাটে বিছানা ভিজে একাকার। আমি ডাকলাম, 'সফিক এই সফিক।'

কোন উত্তর নাই। বাইরে বেরিয়ে দেখি সে সিগারেট হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে। আমাকে আসতে দেখে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ঘুম আসেছে নারে।'

বৃষ্টিতে ভিজছিস তো।

সফিক একটু সরে বলল,

জ্যোতির্ষাণবের জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। সকাল হলেই খুঁজতে বের হব। ঢাকাতেই আছে নিশ্চয়ই।

সফিক খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল,

অনু মারা গেছে। গত পরশু চিঠি পেয়েছি। একটা টেলিগ্রাম করার দরকার মনে করে নাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তুইতো আমাকে কিছু বলিস নাই সফিক।

এই সব বলতে ভাল লাগে না।

কি ভাবে মারা গেল?

সাপে কেটেছিল। তাই লেখা। ওঝা টঝা নাকি এসেছিল। আমি সফিকের হাত ধরলাম। আশ্চর্য জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে! অথচ সহজ স্বাভাবিক মানুষের মত বসে আছে।

তোরতো ভয়ানক জ্বর সফিক।

হ্যাঁ শরীরটা খারাপ।

আয় শুয়ে থাকবি? মাথায় জলপট্টি দেব?

নাহ্ এইসব কিছু লাগবেনা। আমার ভালুক জ্বর ; সকালবেলা থাকবে না দেখবি।

জ্যোতির্ষাণবকে খুঁজে পাওয়া গেলনা।

সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজা হয়। ছিন্নমূল মানুষেরা যে সব জায়গায় রাতে ঘুমায়, সফিক গভীর রাতে সেই সব জায়গায় খুঁজতে যায়। কমলাপুর রেল স্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল লাভ হয়না কিছু। ফুটপাতে যে সব পামিষ্টরা হাতের ছবি আঁকা সাইন বোর্ড টানিয়ে বসে থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়,

লম্বা চুল দাড়ির এক সাধু—হাত দেখেন তাঁকে কেউ দেখেছেন? নিশানাথ নাম।

কেউ কিছু বলতে পারে না। নবী সাহেবের কথা মত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় :

> লম্বা চুল দাড়ি পরনে গেরুয়া রঙ্গের পাঞ্জাবী প্রখ্যাত
> জ্যোতিষ নিশানাথ জ্যোতির্ষাণবের সন্ধান প্রার্থী।

বিজ্ঞাপন ছাপার তিন দিনের দিন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয় আভা। আপনাদের জ্যোতিষী কোথায় গেছে?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলে, কোথায় গেছে জানলে বিজ্ঞাপন দেই নাকি?

আমি ভাবলাম আপনাদের কোন পাবলিসিটির ব্যাপার বুঝি।

তাঁর পাবলিসিটি লাগেনা। সে অনেক বড় দরের জ্যোতিষ।

আভা শান্ত স্বরে বলে,

তিনি বড় জ্যোতিষী ছিলেন। আমার হাত দেখে জন্মবার বলে দিয়েছিলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

শুধু নিশানাথ নয় নবী সাহেবও পান্থনিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। স্কুল থেকে মহাসমারোহে তাঁকে বিদায় দেয়া হয়েছে। আমরাও তাঁর বিদায় উপলক্ষে একটু বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। খেতে পারলেন না। মুখে নাকি কিছুই রুচছে না। খাওয়া বন্ধ করে একবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন,

আমি আর বেশিদিন বাঁচবনা। পান্থনিবাসে শিকড় গজিয়ে গেছে। বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পরতে লাগলো।

সিরাজ সাহেবের প্রমোশন হয়েছে। অফিসার্স গ্রেড পেয়েছেন। অফিস থেকে তাঁকে কোয়ার্টার দেয়া হয়েছে। সুন্দর কোয়ার্টার, তাঁর সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখে আসলাম। দক্ষিণ দিকে চমৎকার বারান্দা। হু হু করে হাওয়া বয়। সিরাজ সাহেবও পান্থনিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগের দিন রাতে বিদায় নিতে এলেন আমাদের কাছ থেকে। কথা সরে না তাঁর মুখে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ চাপ। এক সময় বললেন,

সুখেই ছিলাম ভাই আপনাদের সাথে। আনন্দেই ছিলাম। নিশানাথ বাবুর খালি ঘরটা দেখলে চোখে পানি আসে। আমার স্ত্রীকে তিনি বড় স্নেহ করতেন।

সত্যি সত্যি চোখে পানি ছলছলিয়ে উঠল। সফিক শুয়ে ছিল। সফিকের মাথায় হাত রেখে বললেন,

জ্বর কি আবার এসেছে?

আছে অল্প।

অবহেলা করবেন না ভাই। ভাল ডাক্তার দেখাবেন।

ক্ষাণিকক্ষণ চুপ থেকে আমতা আমতা করে বললেন,

আমি অতি দরিদ্র মানুষ তবু যদি কখনো কোন প্রয়োজন হয়–

সফিক কথার মাঝখানে আচমকা জিজ্ঞেস করল,

আপনার ছোট বোন রেবা, তাঁর কি বিয়ে হয়েছে?

হ্যাঁ গত বৈশাখ মাসে বিয়ে দিয়েছি। ঢাকাতেই থাকে। ভাল বিয়ে হয়েছে। ছেলেটা অতি ভাল। আমি ভাবি নাই এত ভাল বিয়ে দিতে পারব।

সফিক আর কিছু বললোনা। সিরাজ সাহেব বললেন,

আপনারা দুজন একদিন গিয়ে যদি দেখে আসেন সে খুব খুশী হবে। আপনাদেরকে চিনে খুব। সেইদিনও জিজ্ঞেস করল আপনার অসুখের কথা।

নুতন কোন বোর্ডার এলনা পান্থনিবাসে। শুনেছি রশীদ মিয়া মেস ভেঙে বাড়ী বানিয়ে ভাড়া দিবেন। মেসে নাকি তেমন আয় হয় না। এর মধ্যে মা'র চিঠি পেলাম :

> তোমার পাঠানো একশত টাকা পাইয়াছি। আমি শুনিয়া মর্মাহত হইলাম যে তুমি পড়াশুনা ছাড়িয়া কাপড় ফেরি করিয়া বেড়াও। তোমার দুই মামা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তোমার মনে রাখা উচিত তোমার নানা অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তুমি ছোটলোকের মত ফেরিওয়ালা হইয়াছ এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি। পারুলের মত তুমিও যে বংশের মান ডুবাইবে তাহা ভাবি নাই। দোয়া জানিও। অতি অবশ্য একবার আসিবে। তোমার বাবার একটি পা অচল। হাঁটা চলা করিতে পারেন না।—'

চিঠি পড়ে আমি দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকি। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

॥ সাত ॥

আজকাল বড় অস্থির লাগে।

সব যেন অগোছালো হয়ে গেছে। সুর কেটে গেছে। সফিকের সেই হাসি খুশী ভাব নেই। তার জ্বর কখনো থাকে কখনো থাকে না। মেডিকেল কলেজ থেকে এক্সরে করিয়ে এসেছে যক্ষা টক্ষা কিছু নেই। তার ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে যেন প্রেসের পুরানো চাকরিটা আবার যোগাড় করেছে। আজকাল সে কৃপণের মত টাকা জমায়। তার খরচপাতি এম্নিতেই অবশ্যি কমে গেছে। বোনকে টাকা পাঠাতে হয় না। আদর করে একটি পয়সাও খরচ করে না। মেডিকেল কলেজের ছোকড়া ডাক্তারটি বার বার বলেছিল,

ভাল ভাল খাবার খাবেন। দুধ টুধ নিয়মিত খাবেন। আপনার এখন হাই প্রোটিন ডায়েট দরকার। ডাক্তারের কথা সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

হাই প্রোটিন ডায়েট খাব পয়সা কোথায়? পাস বুকের পাই পয়সাও খরচ করব না।

সে একটি সাইন বোর্ড লিখিয়ে এনেছে–

"নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেষ্টুরেন্ট"

প্রকান্ড সাইন বোর্ড। খবরের কাগজে মুড়ে সেই সাইন বোর্ডটি রাখা হয়েছে চৌকির নিচে। মাঝে মাঝে রাত জেগে সে টাকা পয়সার হিসাব মিলায়। হাসি মুখে বলে,

দেরী নাই আর। শুরু করে দিতে হবে।

তার চোখ জ্বল জ্বল করে। গম্ভীর হয়ে বলে, 'ছোট থেকে শুরু হবে। প্রথমে থাকবে সাদামাটা চায়ের দোকান। তারপর বড় একটা হোটেল দেব। একটা হুলুস্থুল কান্ড করব দেখবি।'

সেই হুলস্থুল কান্ড করবার জন্যে সে প্রায়ই না খেয়ে থাকে।

একদিন বললো, চায়ে চিনি দেবার দরকার কি? চীনারা বিনা চিনিতে দিব্যি চা খাচ্ছে। না চিনিটা আমি উঠিয়েই দেব, অনেকগুলি টাকা বাঁচে বুঝলি?

পান্থ নিবাসের নাম ফলক রশীদ মিয়া সরিয়ে ফেলেছে। তিন তলায় নতুন নতুন ঘর উঠছে। জানালায় নতুন শিক বসানো হচ্ছে। চুনকাম হচ্ছে। একদিন দেখি 'রোকেয়া ভিলা' নামে একটা সাইন বোর্ড শোভা পাচ্ছে। আমাদের কাছে নোটিশ দিয়েছে, 'দুই মাসের ভেতর বাড়ী খালি করে দিতে হবে। অন্যথায় আইনের আশ্রয় নেয়া হবে' এই জাতীয় কথা লেখা।

করিম সাহেব এই নিয়ে খুব হৈ চৈ করছেন, উঠিয়ে দিবে বললেই হল? হাইকোর্টে কেইস করে শালার পাতলা পায়খানা বের করে দিব না? উঠিয়ে দেয়া খেলা কথা না। হু হু।

করিম সাহেব আজকাল প্রায় রাতেই মদ টদ খেয়ে এসে বিশ্রী সব কান্ড কারখানা করেন। কেউ কিছু বললেই আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করেন,

নিজের পয়সায় খাই। কারোর বাপের পয়সায় না। কারোর সাহস থাকে বলুক দেখি মুখের সামনে। জুতিয়ে দাঁত খুলে ফেলব না? ভদ্রলোক চিনা আছে আমার।

সত্য মিথ্যা জানিনা, শুনছি অফিসে কি একটা টাকা পয়সার গন্ডগোলের জন্য করিম সাহেবকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্ত টদন্ত হচ্ছে। কথাটা সত্যি হতেও পারে। কয়েক দিন ধরে দেখছি অফিসে যান না। গতকাল আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কি ব্যাপার করিম সাহেব অফিসে যান না দেখি।

করিম সাহেব রেগে আগুন।

যাই না যাই সেটা আমার ব্যাপার। আপনে কোথাকার কে? আপনার খাই? না আপনার পরি?

বি.এ. পরীক্ষার ফিস জমা দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। নবী সাহেবের ঘরটিতে এখন একা একা থাকি। দিন রাত পড়তে চেষ্টা করি। নীরস পাঠ্য বইয়ের স্তূপ একেক সময় অসহ্য বোধ হয়। কোথায়ও হাঁফ ছাড়বার জন্যে যেতে ইচ্ছে হয়। যাওয়ার জায়গা নেই কোন। আমার ছাত্রীটির বাসায় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিনা দরকারে শুধু শুধু যাওয়া। শেলীর বাবা মা কেউ কিছু মনে করেন কি না তাই ভেবে যাওয়া হয় না।

মাকে দেখতে গিয়েছিলাম এর মধ্যে। মা আগের মতই আছেন। এতদিন ধারণা ছিল বোধহয় খুব কষ্টে আছেন। কিন্তু দেখা গেল অবস্থা মোটেই সে রকম নয়। বাড়ীর পেছনে সব্জী বাগান করেছেন। হাঁস মুরগী পালছেন। ধান চাল রাখার জন্য নতুন একটি ঘর তোলা হয়েছে। এমন অবাক লাগলো দেখে ! বাবার প্যারালিসিসও তেমন কিছু নয়। দেয়াল ধরে বেশ দাঁড়াতে পারেন।

অঞ্জু দেখলাম অনেক বড় হয়েছে। তাকে অতি কড়া শাসনে রাখা হয়। অঞ্জুর কাছেই শুনলাম সে ঘুমিয়ে পড়লে মা তার বই খাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেন। যেন পারুলের মত কিছু আবার না ঘটে। অঞ্জু অনেক চালাক চতুর হয়েছে। অনেক কথা বলল সে। গল্প বলাও বেশ শিখেছে।

পারুল আপা ভালই করেছে দাদা। কি যে দিন গেছে আমাদের। কতদিন শুধু একবেলা রান্না হয়েছে। মা'র মেজাজতো জানই। সব সময় আগুনের মত তেতে থাকতেন। একদিন কি করেছেন শোন—বাবা দেরী করে ফিরেছেন। এগারোটার মত বাজে প্রায়। মা দরজা খুললেন না কিছুতেই।

খুললেন না কেন?

কে জানে কেন? কে যাবে জিজ্ঞেস করতে ?

অঞ্জু এক ফাঁকে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নাকি দাদা বাড়ী বাড়ী কাপড় ফেরি করে বেড়াও? কত কান্ড হল এই নিয়ে। মামারা রেগে আগুন।' বাবা বেচারা সরল মানুষ। ছোট মামাকে বলেছেন, 'তুমি নিজেওতো মানুষদের বাড়ী গিয়ে রোগী দেখ। তাতে দোষ হয়না?

অঞ্জু হাসতে লাগলো খিল খিল করে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, ছোট মামা তখন একেবারে হাউইয়ের মত নাচতে লাগলেন। মা'র সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হল তখন। মায়ের সঙ্গে ঝগড়ায় কে পারবে বল? ছোট মামা হেরে ভূত।

মা'র সঙ্গে ঝগড়া কি নিয়ে?

জমি নিয়ে। নানার সম্পত্তির ওয়ারিশান চাইলেন মা। তাতেই লেগে গেল।

ওয়ারিশান পেয়েছেন?

পাবেন না মানে? মাকে তুমি এখনো চেন নাই দাদা।

অঞ্জুর কছে শুনলাম মা আজকাল কারো সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। আমার সঙ্গেও বললেন না। অভাবে অনটনে এরকম হয় নাকি মানুষ? আবেগ শূন্য কথাবার্তা। সেই চরম অভাব এখনতো আর নেই। এখন এরকম হবে কেন? বাবার ধারণা মায়ের সঙ্গে জ্বীন থাকে। আমাকে একবার একা পেয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'সব জ্বীনের কান্ড কারখানা।'

কিসের কান্ড কারখানা?

জ্বীনের। তোর মাকে জ্বীনে ধরেছ।

কি যে বলেন আপনি।

বাবার পাগলামী মনে হল সেরে গেছে। সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন,

সফিক কেমন আছে? রেবাকে বিয়ে করেছে নাকি? আহা কেন করল না। নিশানাথ কই? সন্ন্যাসী হয়ে গেছে? আহারে বড় ভাল মানুষ ছিল। সন্ন্যাসী তো হবেই। ভালো মানুষ সংসারে থাকতে পারে?

অঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবার বেহালার সখ মিটে গেছে নাকিরে?' অঞ্জু লাফিয়ে উঠল, সবেচে দারুণ খবরটা তোমাকে দেয়া হয়নি দাদা। বাবা চমৎকার বেহালা বাজায়। যা চমৎকার। যা চমৎকার।'

সেকি?

হ্যাঁ দাদা, তুমি বিশ্বাস করবে না কি চমৎকার! মা পর্যন্ত হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বেহালা কিনেছেন নাকি বাবা?

না হারু-গায়েনকে খবর দিলেই সে বেহালা দিয়ে যায়। তুমি আজ বল বাবাকে বাজাতে। সন্ধ্যার পর সবাই গোল হয়ে বসব। বেশ হবে দাদা। বলবে তো?

বাবাকে বেহালা বাজানোর কথা বলতেই তিনি আৎকে উঠলেন, পূর্ণিমা আজকে। পূর্ণিমার সময় বেহালা বাজালে পরী নামে এটাও জানিস না, গাধা নাকি? পরক্ষণেই গলার স্বর নামিয়ে বললেন, তুইতো বিশ্বাস করলি না যখন বললাম তোর মার সঙ্গে জ্বীন আছে। জ্বীন আছে বলেইতো যখন বাজাই তখন এমন করে তাকায় আমার দিকে-ভয়ে আমার বুক কাঁপে। এই দেখ হাতের লোম খাড়া হয়ে গেছে।

ঢাকায় ফিরে আসার আগের দিন মা আমাকে একশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, তুমি যে টাকা পাঠিয়েছিলে সেই টাকা। সাথে নিয়ে যাও। ফেরিওয়ালা হবার দরকার নাই। যখন টাকার দরকার হবে লিখবে।

আমার চোখে পানি এসে গেল। মা এরকম হয়ে গেলেন কি করে? দুদিন ছিলাম। এর মধ্যে একবার মাত্র তিনি আগের মত সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা বললেন। আগের মত নরম স্বরের মিষ্টি কথা, 'তোর বাবার বেহালা শুনে যা। মানুষের মধ্যে যে কি গুণ আছে তা বোঝা বড় কষ্ট। এখন বড় আফসোস হয়।' কে জানে তাঁর এই আফসোস কি জন্যে?

বাবার কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম তিনি যেন কেমন কেমন ভঙ্গিতে তাকালেন। যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পর গম্ভীর হয়ে বললেন,

চলে যাবেন যে চা টা খেয়েছেন? চা না খেয়ে যাবেন না যেন। অঞ্জু খিল খিল করে হাসতে হাসতে বললো, আপনি আপনি করছ কেন বাবা? চিনতে পারছ না?

বাবা রাগি গলায় বললেন,

হাসিস না শুধু শুধু চিনব না কেন? না চেনার কি আছে?

বাবা ঘোর লাগা চোখে তাকালেন। আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠলো। সত্যি তাহলে আমাকে চিনতে পারছেন না। অঞ্জু বলল, তুমি মনে হয় ঘাবড়ে গেছ দাদা। মাঝে মাঝে বাবার এরকম হয়। কাউকে চিনতে পারেন না। আবার ঠিক হয়ে যায়।

ঢাকায় এসে দুটি চিঠি পেলাম। একটি পারুলের। পারুলের চিঠিতে একটা দারুণ মজার খবর আছে। তার জমজ মেয়ে হয়েছে। পারুলের সব কান্ড কারখানাই অদ্ভুত। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছে শেলী। তিন লাইনের চিঠি।

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার সালাম জানবেন। মা আপনাকে চিঠি লিখতে বললেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি আর আসেন না কেন?

বিনীতা

শেলী

॥ আট ॥

এত বড় বাড়ী খাঁ খাঁ করছে।

কেউ কোথাও নেই। গেটের পাশে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকতো আজ সেও নেই। দরজার সামনে ভারী পর্দা দুলছে। পর্দা টেনে ভেতরে ঢুকতে সংকোচ লাগলো। কে জানে হয়তো শেলীর মা ভেতরে বসে আছেন। তিনি কখনো আসেন না আমার সামনে। হয়ত বিরক্ত হবেন। হয়ত লজ্জা পাবেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম এগারোটা বাজার ঘন্টা দিচ্ছে। এদের বসবার ঘরে অদ্ভুত একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। বাজনার মত শব্দে ঘন্টা বাজে।

কাকে চান?

আমি চমকে দেখি চশমা পড়া একজন মহিলা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। কে জানে ইনিই হয়তো শেলীর মা। থেমে থেমে বললাম,

আমি শেলীর মাষ্টার।

হ্যাঁ আমি চিনতে পারছি। কি ব্যাপার?

আমাকে আসতে বলেছিলেন।

কে আসতে বলেছিলেন?

শেলীর মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রমহিলার ভ্রু কুঞ্চিত হল। অবাক হয়ে তাকালেন।

আমি, আমি খবর দিয়েছিলাম? কেন, আমি খবর দিব কেন? ঘাম বেরিয়ে গেল আমার। পিপাসা বোধ হল। শেলীর মা শান্ত স্বরে বললেন,

ঘরে এসে বসুন। কেউ নেই আজকে। শেলী তার ফুপার বাসায় গেছে। ফিরতে রাত হবে। আচ্ছা খবর দিয়েছে কে?

আমি ঘামতে ঘামতে বললাম,

তাহলে হয়ত ভুল হয়েছে আমার। আচ্ছা আমি তাহলে যাই।

না না চা খেয়ে যাবেন। চা দিতে বলছি। খবর কে দিয়েছে আপনাকে?

আমি শুকনো গলায় বললাম,

শেলী চিঠি দিয়েছিল।

ও তাই। আছে চিঠিটা? দেখি একটু।

শেলীর মা ভ্রু কুঁচকে সে চিঠি পড়লেন। বন্ধ করে খামে ভরলেন আবার খুলে পড়লেন। আমার মনে হল তাঁর ঠোটের কোণায় একটু যেন হাসির আভাস।

চা আসতে দেরী হল না। চায়ের সঙ্গে দুটি সন্দেশ। ঝক ঝকে রূপোর গ্লাসে বরফ মেশানো ঠান্ডা পানি। ভদ্রমহিলা খুব কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে বার বার তাকাচ্ছেন। এক সময় যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ একবার অবিশ্য বলেছিলাম শেলীকে তোমাকে এখানে আসবার কথা লিখতে। তেমন কোন কারণে নয়।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। ভদ্রমহিলা বললেন, বয়সে অনেক ছোট তুমি। তুমি করে বলছি বলে আবার রাগ করছনাতো?

জ্বিনা।

তুমি আজ রাতে নটার দিকে একবার আসবে? শেলীর বাবা বাসায় থাকবেন তখন। আসতে পারবে?

যদি বলেন আসতে আসব।

হ্যাঁ। আসবে তুমি। আমি বরং গাড়ী পাঠাব।

গাড়ী পাঠাতে হবে না। আমি আসব।

আর শোন, শেলীর চিঠিটা থাকুক আমার কাছে।

সমস্ত দিন কাটল এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে। একি কান্ড করল শেলী? কেন করল? বোধহয় কিছু না ভেবেই করেছে। সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। কিছুই ভাল লাগছেনা। প্রচন্ড মাথা ধরেছে। এর মধ্যে করিম সাহেব এসে খ্যান খ্যান শুরু করেছেন। তাঁর বক্তব্য—সফিক কোন সাহসে তাকে চায়ের দোকানে যোগ দিতে বলল। চাকুরী নাই বলেই রিকশা ওয়ালাদের জন্যে চা বানাতে হবে? সফিক ভেবেছেটা কি? মান–সম্মান বলে একটা জিনিস আছে ইত্যাদি। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। করিম সাহেব বক বক করতেই লাগলেন,

আমার দাদার বাবা ছিলেন জমিদার বুঝলেন? তিনটা হাতী ছিল আমাদের। জুতা হাতে নিয়ে আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে কেউ হাঁটতে পারতনা। জুতা বগলে নিতে হত। আমাদের বসত বাড়ীর ইট বিক্রি করলেও লাখ দুই লাখ টাকা হয় বুঝলেন?

সফিক আসলো সন্ধ্যাবেলা। অতিব্যস্ত সে। এসেই এক ধমক লাগালো,

সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছিস। কাপড় পর। 'নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট' দেখিয়ে আনি।

আরেক দিন দেখব। আজ কাজ আছে এক জায়গায়। নটার সময় যেতে হবে।

নটা বাজতে দেরী আছে উঠ দেখি। করিম সাহেব আপনিও চলেন দেখি। সবাই মিলে রেস্টুরেন্টটা দাঁড় করিয়ে দেই।

করিম সাহেব মুখ লম্বা করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সফিক হাসি মুখে বলল,

ঘর ভাড়া নিয়ে নিয়েছি। সাইন বোর্ড আজ সকালে টাঙ্গিয়ে দিয়ে আসলাম। জিনিসপত্তর কেনা কাটি বাকি আছে। লালুকে সাথে নিয়ে সেইসব কিনব, এক্সপার্ট আদমী সে।

সফিকের উৎসাহের সীমা নেই। আমি শুনছি কি শুনছিনা সেই দিকেও খেয়াল নেই। নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছে,

ঘরের মধ্যে পার্টিসন দিয়ে থাকার জায়গা করেছি। দিব্যি পড়াশুনা করতে পারবি তুই। ইলেকট্রিসিটি আছে অসুবিধা কিছু নাই। তুই আর করিম সাহেব তোরা দুইজন কাল পরশুর মধ্যে চলে আয়।

করিম সাহেব?

হ্যাঁ ও আর যাবে কোথায়? পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কি আর নতুন করে চাকরী করা যায়? দুই একদিন গাঁই গুঁই করবে তারপর দেখবি ঠিকই লেগে পড়েছে হা হা হা।

ঘরের সামনে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নড়বড়ে একটা ঘর কোন মতে দাঁড়িয়ে আছে।

এই তোর ঘর?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলল,

তুই কি ভেবেছিলি? একটা সাত মহল রাজ প্রাসাদ?

কে আসবে তোর এখানে চা খেতে?

আসবে না কেন সেইটা শুনি আগে?

একটা ছেলে এসে ঘরের তালা খুলে দিল। সফিক হৃষ্ট চিত্তে বলল, এর নাম কাল্লু। দারুণ কাজের ছেলে।

কিরে ব্যাটা আছিস কেমন?

বালা আছি স্যার।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সব। সারি সারি বেঞ্চ পাতা। ফাঁকে ফাঁকে আবার টুল কাঠের চেয়ার। মেঝেতে ইদুঁর কিংবা সাপের গর্ত। দরমার বেড়ায় এক চিলতে জায়গা আবার আলাদা করা। তার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা দুটি জরাজীর্ণ চৌকি।

সফিক বললো,

কিরে পছন্দ হয়েছে?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, ভালই তো।

বুঝতে পারছি তোর পছন্দ হয়নি। দেখবি সব হবে। আমি না খেয়ে দিন কাটিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় সূঁচ পর্যন্ত বিক্রি করেছি আমি, কি ভেবেছিস ছেড়ে দিবো? আয় চা খাই।

কোথায় চা খাবি?

পাশেই চায়ের দোকান আছে একটা।

চায়ের দোকানের মালিক সফিককে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল।

সফিক হাসিমুখে বলল,

ভাল আছেন নাকি রহমান সাব?

ভাল আর কেমনে থাকুম কন। আমার দোকানের পিছে দোকান দিছেন, ভাল থাকন যায়?

এইতো ভালরে ভাই কম্পিটিশন হবে। যেটা ভাল সেটা টিকবে।

সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলো। হাসি থামিয়ে বলল,

রহমান সাব সব বি.এ.এম.এ. পাশ ছেলেরা কাজ করবে আমার দোকানে। এই দেখেন একজন বি. এ. পাশ।

রহমান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। সফিক গম্ভীর হয়ে বলল,

আর আমাদের ম্যানেজার কে জানেন নাকি? নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব। জ্যোতিষ সাগার। বুঝেন কান্ড ইয়া দাড়িাইয়া গোঁফ।

রহমান সাহেব নিস্পৃহ সুরে বললেন,

ভদ্রলোক আপনেরা সাবধানে থাকবেন। পাড়াটা গুন্ডা বদমাইশের পাড়া। আমি থাকতে পারিনা আর আপনেরা নতুন মানুষ।

সফিক হেসেই উড়িয়ে দিলো,

গুন্ডা বদমাইশ কি করবে আমাদের ? আমাদের ম্যানেজার সাক্ষাত দুর্বাষা মুণি। কাঁচা গিলে ফেলবে।

কাঁচা গিললেতো ভালই। আপনেরা চা খাইবেন? এই চা দে দেখি।

রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে বিড়ি ধরালেন। সফিক ফিস্ ফিস্ করে বলল, ব্যাটা তখন থেকেই ভয় দেখাচ্ছে শুধু। একবার মিনো গুন্ডাকে নিয়ে আসবো। মিনো গুন্ডাকে দেখলে রহমান সাহেবের দিল ঠান্ডা হয়ে যাবে দেখিস।

মিনোটা কে?

আছে আছে। আমার কাছেও জিনিস পত্র আছে। হা হা হা। মিনো গুন্ডা আমার ছাত্র ছিল।

পান্থ নিবাসে ফিরলাম রাত আটটার দিকে। বাড়ীর সামনের জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে কে যেন বসে আছে। সফিক কড়া গলায় বলল,

কে ওখানে কে?

কোন সাড়া শব্দ নেই। আরেকটু এগিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে কি ধরনের যেন অনুভূতি হল। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে চেচাঁলাম,

কে কে?

আমি নিশানাথ।

আমরা অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। সফিক প্রথম বলল, ভাবলেশ হীন গলা,

এইখানে কি মনে করে নিশানাথ বাবু? কিছু ফেলে গিয়েছিলেন নাকি?

নিশানাথ বাবু শান্ত গলায় বললেন,

তুমি ভাল সফিক?

আমি কেমন আছি তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নিশানাথ বাবু? আমি দৌড়ে গিয়ে নিশানাথ বাবুর হাত ধরে ফেললাম। গাঢ় স্বরে বললাম,

আসেন ঘরে আসেন।

প্রায় দু'মাস পর দেখছি জ্যোতির্ষাণবকে। গেরুয়া পাঞ্জাবী ছাড়া সব কিছু আগের মতই আছে। পাঞ্জাবীর বদলে সাদা রঙের একটি সার্ট। বেশ খানিকটা রোগা লাগছে। চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নাকি আমার দেখার ভুল।

সফিক এমন একটা ভাব করতে লাগলো যেন জ্যোতির্ষাণবের ফিরে আসাটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। সাধুজী যেন চা খেতে গিয়েছিল। চা খেয়ে ফিরে এসেছে। সে গুন গুন করে কি একটা গানের কলি ভাঁজল। তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে হিসাব পত্রের খাতা বের করে কি যেন দেখতে লাগলো। এমন সব ছেলে মানুষী কান্ড সফিকের। শেষ পর্যন্ত আমার অসহ্য বোধ হল। চেঁচিয়ে বললাম,

বন্ধ করতো খাতাটা।

সফিক খাতা বন্ধ করে গম্ভীর স্বরে বলল,

নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব, আপনাকে আমাদের ম্যানেজার করা হয়েছে।

কিসের ম্যানেজার?

চায়ের দোকান দিয়েছি আমরা।

জ্যোতির্ষাণবের ঠোঁটের কোণায় হাসি খেলে গেল। হালকা গলায় বললেন,

সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত রেষ্টুরেন্ট দিয়েছ?

হ্যাঁ ঘর ভাড়া হয়ে গেছে।

ঘর ভাড়া হয়ে গেছে?

হুঁ।

জ্যোতির্ষাণব হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। সফিক মৃদু স্বরে বলল,

নৈশব্দের পরী উড়ে গেছে তাই না নিশানাথ বাবু? হঠাৎ সবাই চুপ করলে পরী উড়ে যায় তাই না?

জ্যোতির্ষাণব মৃদু স্বরে বললেন, তোমার অসুখটা সেড়েছে সফিক?

হ্যাঁ সেরেছে।

জ্বর আসেনা আর?

আর কোনদিন আসবে না।

আমি বললাম,

আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন?

জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

খেতেন কি?

আশ্চর্যের কথা কি জান? খাওয়া জুটে গেছে। না খেয়ে থাকিনি কখনো। পান্থনিবাসে বরং আমার কষ্ট হয়েছে বেশি।

সফিক দৃঢ় স্বরে বলল,

আর কষ্ট হবে না। আর কখনো না খেয়ে থাকতে হবে না। দেখবেন দিন কাল পাল্টে ফেলবো।

নিশানাথ বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। যেন সফিকের কথাটি ঠিক নয়। সফিক ভুল বলছে। আমি বললাম,

আমাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন?

খুব মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। মায়া কাটানোর জন্যেই এটা করেছি।

সফিক কড়া গলায় বলল,

মায়া কেটেছে?

নিশানাথ বাবু থেমে বললেন,

মায়া কাটছে সফিক।

তাহলে ফিরে আসলেন কেন?

জ্যোতির্ষাণব তার জবাব না দিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটি ছেলেমানুষী প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছে। কিন্তু নটা বেজে যাচ্ছে আমি আর থাকতে পারিনা। আমি উঠে দাঁড়ালাম,

এক ঘন্টার মধ্যে আমি আসব। একটা খুব জরুরী কাজ আছে না গেলেই নয়।

জ্যোতির্ষাণব আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

শেলীর বাবা বললেন, 'তোমার দেরী দেখে ভাবলাম হয়তো আসবে না। গাড়ী পাঠাব কিনা তাই ভাবছিলাম।' শেলীর মা কোণার দিকে একটি সোফায় বসেছিলেন, তিনি গলা উঁচিয়ে ডাকলেন,

শেলী শেলী।

শেলী এসে দাঁড়াল পর্দার ও পাশে। হয়ত সে এখানে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বললো,

কি জন্যে ডাকছ মা।

ভেতর আস। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

বলনা কি জন্য ডাকছ?

তোমার স্যারকে চা দাও।

শেলীর বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, দুপুর রাতে চা কেন? টেবিলে খাবার দিতে বল। তুমি নিশ্চয়ই খেয়ে আসনি? আর খেয়ে এসে থাকলেও বস।

খাবার টেবিলে অনেক কথা বললেন ভদ্রলোক। কত কষ্ট করে পড়াশুনা করেছেন। মানুষের বাড়ীতে আশ্রিত হিসেবে থাকতেন। সেইসব কথা বলছেন গর্ব এবং অহংকারের সঙ্গে। একজন সফল মানষের মুখে তার দুর্ভাগ্যের দিনের কথা শুনতে ভালই লাগে। শেলীর মা একবার শুধু বললেন,

এই সব কথা ছাড়া তোমার অন্য গল্প নাই?

ভদ্রলোক হা হা করে হাসতে লাগলেন। যেন মজার একটি কথা বলা হয়েছে। শেলী একটি কথাও বললনা একবার ফিরেও তাকাল না আমার দিকে। একটি গাঢ় নীল রঙের শাড়ীতে তাকে জলপরীর মত লাগছিল। শাড়ীতে কখনো দেখিনি তাকে। এ যেন অন্য একটি মেয়ে। শেলির মা খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করছিলেন,

ক ভাই বোন আমরা। কি তাদের নাম। কি করছে। পান্থ নিবাসে থেকে পড়াশুনা করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়। পড়াশুনা শেষ করে কি করব?

খাওয়া শেষ হতেই আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আমি কি এখন যাবো? ভদ্রলোক আবার হা হা করে হেসে উঠলেন। যেন এই কথাটিও অত্যন্ত মজার। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন,

নিশ্চয়ই যাবে। তবে তুমি একটা কাজ কর আমার এখানে অনেক খালি ঘর পড়ে আছে। তুমি আমার এখানে এসে থাক।

শেলীর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি চলে আস এখানে পড়াশুনার তোমার খুব সুবিধা হবে। তা ছাড়া শেলী বেচারী খুব একলা হয়ে পড়েছে। তুমি থাকলে ওর একজন সঙ্গী হয়।' বলতে বলতে তিনি মুখ টিপে হাসলেন। শেলীর দিকে ফিরে বললেন,

ড্রাইভারকে গাড়ী বের করতে বলতো মা। তোমার স্যারকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। রাত হয়ে গেছে।

শেলী আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসল। কিছু একটা বলা উচিত তাকে। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলাম না। গাড়ীতে ওঠার সময় শেলী শান্ত স্বরে বললো,

আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।

ঘরে ফিরে দেখি সফিক শুয়ে আছে। তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। বোধহয় আবার জ্বর আসছে। সফিক ক্লান্ত স্বরে বললো,

নিশানাথ চলে গেছে। বিদায় নিতে এসেছিল আমাদের কাছে।

কোথায় গেছে?

প্রথমে বারহাট্টা। সেখান থেকে যাবেন মেঘালয়ে। তাঁর কোন জ্ঞাতি খুঁড়ো থাকেন তাঁর কাছে যাচ্ছে। ঐখানেই থাকবে।

আমার অবাক হওয়ার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। সফিক বললো,

কি জন্যে থাকবে সে? তিন পুরুষের কুলধর্ম ছাড়তে পারে কেউ?

আর আসবেনা ফিরে?

না।

সফিক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে উত্তেজিত স্বরে বললো,

নিশানাথ না থাকুক তুইতো আছিস। দুজনে মিলে দেখ না কি কান্ড করি।

আমি চুপ করে রইলাম। সফিক শুয়ে পড়ল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর। সফিক আচ্ছন্নের মত বলল,

জ্যোতিষার্ণব কিন্তু সত্যি ভাল হাত দেখে। আজ আমি অবাক হয়েছি–খুব অবাক হয়েছি তাঁর ক্ষমতা দেখে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কি বলেছে জ্যোতির্ষাণব?'

সফিক সে কথার জবাব দিল না। আমি অবাক হয়ে দেখি তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। অশ্রু গোপন করবার জন্যে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু স্বরে বললো,

শুধু জ্যোতিষার্ণব কেন তুই নিজেও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাস আমার তাতে কিছুই যাবে আসবে না। আমি ঠিক উঠে দাঁড়াব।

সেই রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। যেন আদিগন্ত বিস্তৃত একটি সবুজ মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে সফিক দাঁড়িয়ে আছে একা একা। তার গায়ে 'মুকুট'

নাটকের মধ্যম রাজকুমারের পোষাক। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না ভেজা সেই রাতে সবুজ মাঠের মাঝখান থেকে সাফিক যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল।

ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। বাইরে এসে দেখি ফকফকা জ্যোৎস্না হয়েছে। বারান্দার মেঝেতে অপূর্ব সব নক্শা। পায়ে পায়ে এগিয়ে উঁকি দিলাম সফিকের ঘরে।

সফিক অন্ধকারে বসে চা খাচ্ছে একা একা। আমাকে দেখে সে হাসি মুখে ডাকল, চা খাবি রঞ্জু? আয়না জ্বরটা সেরে গেছে। আমার বেশ লাগছে এখন। অকারণেই আমার চোখে জল আসল।